প্রাচ্যবাণী

প্রবন্ধাবলী

চতুর্থ খণ্ড

মহাকবি

নবীনচন্দ্র-স্মৃতি-তর্পণ

১ম ভাগ

প্রাচ্যবাণীর যুগ্মসম্পাদক—প্রেসিডেন্সী কলেজ ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

এফ-আর-এ-এস (লণ্ডন)

কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণী
৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও

প্রাচ্যবাণী
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা, ১৩৫৩

মূল্য এক টাকা

কাপড়ে বাঁধাই দেড় টাকা

মুদ্রাকর—ঈশাক মল্লিক
নিউ ডায়মণ্ড প্রেস,
৮-বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

বঙ্গের অমর-কবি নবীনচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। তাঁর বাণী বর্ত্তমান যুগের বেদবাক্য; অখণ্ড ভারত স্থাপনে তাঁর অনন্ত কামনা—সমস্ত হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত আর্য্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রীষ্টান সকলের মিলন প্রত্যাশা—সমগ্র দেশবাসীকে পরিত্রাণের পথে উদ্বুদ্ধ করছে। তাঁর "পলাশীর যুদ্ধ" জাতীয়তাবাদী প্রথম কাব্য; তাঁর "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" পাঞ্চজন্য নিনাদে দেশের সুষুপ্তি নিরাকরণ এবং জাতীয় সংগ্রামে দেশবাসীকে আবাহন করেছে। তাই এক বৎসর ধরে ভারতবর্ষের সর্বত্র নবীনচন্দ্র স্মৃতি-তর্পণের যে ব্যবস্থা চলেছে এবং অগণিত সভাসমিতি হচ্ছে—তা' নবীনচন্দ্রের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অতি সামান্য প্রয়াস মাত্র।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত "সম্পাদকীয়," ও প্রবন্ধাদি ব্যতীত নবীনচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, প্রাচীন সমালোচকদের অভিমত প্রভৃতিও প্রকাশিত হবে। এখনে কেবল অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটী বিষয় লিপিবদ্ধ করছি। এ খণ্ডে "অপ্রকাশিত কবিতাবলী" এবং "নবীন-চন্দ্রের শেষ কথার" জন্য আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রেভেনিউ সেক্রেটারী এবং ডাইরেক্টর অব লেণ্ড-রেকর্ড রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অনুরোধক্রমে অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রবন্ধাদি প্রেরণের নিমিত্ত আমি লেখক-লেখিকাদের কাছে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ রইলাম। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্র লাল সেন; অপ্রকাশিত কতকগুলি চিঠিপত্র এবং নবীনচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত একটী সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে প্রদান করেছেন। তজ্জন্য তাঁর

কাছে আমি ঋণী। গ্রন্থগৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ সদুপদেশ দিয়েছেন বন্ধুবর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুধীরকুমার নন্দী কয়েকটী প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছে।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বড়াল মহাশয় "নবীনচন্দ্র স্মৃতি-তর্পণ" গ্রন্থের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। তজ্জন্য শুধু প্রাচ্যবাণী নয়, তিনি সমগ্র দেশবাসীর, বিশেষতঃ নবীনভক্তমণ্ডলীর, অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

"নবীনচন্দ্র স্মৃতি তর্পণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্যে নিউ ডায়মণ্ড প্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার গোস্বামী বহু যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ করেছেন; তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ এবং এ প্রেস থেকে গ্রন্থ মুদ্রণের সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

নবীনচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র, কবিতা বা অন্যান্য রচনা প্রভৃতি যদি কারো কাছে কিছু থাকে, প্রকাশের জন্য আমার কাছে প্রেরণ করলে বড়ই কৃতজ্ঞ থাকবো। 'আমার জীবন'-এ অপ্রকাশিত কবিবরের জীবন সংক্রান্ত ঘটনাবলীও যদি কেও অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠান তাও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন পূর্ব্বক এ গ্রন্থে, বা বিলম্বে প্রাপ্ত হ'লে প্রবন্ধাবলীর পরবর্ত্তী কোনও খণ্ডে, প্রকাশিত হবে। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

—সূচীপত্র—

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭ সাল

মৃত্যু : ২৩ জানুয়ারী, ১৯০৯ সাল

(১০ মাঘ, ১৩১৫ সাল)

[১৩৫৩ সালে মুদ্রিত]

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র সেন যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

১। **অবকাশরঞ্জিনী,** ১ম ভাগ (খণ্ডকাব্য)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (ইং ১৮৭১) পৃঃ ১৭১। ইহাই কবির প্রথম গ্রন্থ। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁহার আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত।

২। **পলাশির যুদ্ধ** (কাব্য)। বৈশাখ ১২৮২। [১৫ এপ্রিল ১৮৭৫] পৃঃ ১৭৩ পরিশিষ্ট। ইহার একটি "বিদ্যালয় পাঠ্য" সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। **ভারত উচ্ছ্বাস** (কবিতা)। ইং ১৮৭৫] ২০ ডিসেম্বর ১৮৭৫] পৃঃ ১৩। ইহা ২য় ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী'র ১২৯৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতে আগমন করেন, সেই উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' রচিত হয়।

৪। **ক্লিওপেট্রা** (কাব্য)। ১ ভাদ্র ১২৮৪। পৃঃ ৫১।

ইহা ১২৯৫ সালে মুদ্রিত 'অবকাশরঞ্জিনী' ২য় ভাগে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। **অবকাশরঞ্জিনী,** ২য় খণ্ড (কাব্য)। মাঘ ১২৮৪ সাল। [২৯ জানুয়ারি ১৮৭৮]। পৃঃ ২২২।

১২৯৫ সালে প্রকাশিত (পৃঃ ২৮৭) ইহার এই সংস্করণে অতিরিক্ত এই কয়েকটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

ক্লিওপেট্রা, ভারত-উচ্ছ্বাস, বন্ধুতা ও বিদায়, প্রত্যাখ্যান, কীর্ত্তিনাশা, মেঘনা, একবর্ষ, প্রতিকৃতি, কবির উপহার, নবজীবন, প্রকৃতির গীত।

৬। **রঙ্গমতী** (কাব্য)। ১৫ জুলাই ১৮৮০। পৃঃ ২৪৬। শুদ্ধিপত্র।

৭। **রৈবতক** (কাব্য)। ১ ভাদ্র ১২৯৩। [২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭] পৃঃ ৩৮০।

৮। **মার্কণ্ডেয় চণ্ডী** (পদ্যানুবাদ)। [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯] পৃঃ ২০৪।

৯। **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা** (পদ্যানুবাদ)। [ইং ১৮৮৯ ?]। পৃঃ ২২৪।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ-কাল দেওয়া নাই। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (৪র্থ ভাগ পৃঃ ১৭০-৭১) পাঠে জানা যায়, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে ইহা আলোচিত হইয়াছিল।

১০। **খৃষ্ট** (কাব্য)। ১২৯৭ সাল। [৪ মার্চ্চ ১৮৯১] পৃঃ

"মেথু-প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম্ম উদ্ধৃত ও কবিতায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

১১। **প্রবাসের পত্র** (ভারতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)। আশ্বিন ১২৯৯। পৃঃ ১১৮।

"প্রবাসের পত্রের অধিকাংশ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত হইল। পুণা, দণ্ডকারণ্য ও ভারতরমণীর চিত্র, এই তিনখানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।"

১২। **কুরুক্ষেত্র** (কাব্য)। ৩০ বৈশাখ ১৩০০। পৃঃ ৩৪৪।

১৩। **অমিতাভ** (কাব্য)। ২৯ আষাঢ় ১৩০২। পৃঃ ।৵০+২০।
ইহার বিষয় বুদ্ধলীলা।

১৪। **প্রভাস** (কাব্য)।? [১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬] পৃঃ ২৪৫+৬ পরিশিষ্ট।

"রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রবাসে শেষ।"

১৫। **ভানুমতী** (উপন্যাস)। ২৫ মার্চ ১৯০০। পৃঃ ১৭৯।

১৬। **আমার জীবন** (আত্মজীবন) :—

প্রথম ভাগ। ১৩১৪ [১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮] পৃঃ ২৬২+২ নিবেদন।

দ্বিতীয় ভাগ। শ্রাবণ ১৩১৬। পৃঃ ৪২৯।

তৃতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃঃ ৫১৪।

চতুর্থ ভাগ। চৈত্র ১৩১৮। পৃঃ ৪৭৯।

পঞ্চম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০। পৃঃ ৫২৩।

১৭। **অমৃতাভ** (কাব্য)। অগ্রহায়ণ ১৩১৬। পৃঃ ২২৪।

ইহাই কবির শেষ কাব্য। 'অমৃতাভ' কাব্যের বিষয় চৈতন্য-লীলা। কবি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১২শ সর্গ পর্য্যন্ত) রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সহ ইহা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী। ১৩১১ সালে হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে 'নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'অমৃতাভ' ও 'আমার জীবন' ছাড়া নবীনচন্দ্রের সকল পুস্তকই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরে বসুমতী কার্য্যালয় হইতেও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার (৺নবীনচন্দ্র সেনের) শেষ কথা (১)

১। বাঁশের কাঠায় [প্রস্তুত] করিয়া তাহা নেওয়ারের মারকিন দিয়া ছাইয়া তাহাতে আমাকে শ্মশানে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নিবে।

২। চন্দন ও বিভূতি মাখাইয়া গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পরাইয়া, মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ি বাঁধিয়া ও সাথে গেরুয়া রঙ্গের চাদর দিয়া ঢাকিবে। যদি মুখ বিকৃত না হয় মুখ আঢাকা রাখিবে।

৩। যদি পাওয়া যায় ঘি ও চন্দন দিয়া দাহন করিবে। শিববাড়ীর পূর্ব্বদিকে বাগানের মধ্যে দাহন করিবে। পূরক ইত্যাদি ভোলা (২) কি পুটু (৩) দিবে।

৪। নির্ম্মলকে এ সংবাদ টেলি দিবে। নির্ম্মল ভাগীরথী তীরে সুপবিত্র গঙ্গার জলে সামান্য ব্যয়ে শ্রাদ্ধ করিবে।

৫। স্ত্রী, রমেশ, (৪) রমেশকে (৫) সব সংসারের ভার দিলাম। তিনজনে পরামর্শ করিয়া সব সংসার............... ...তাহাদের কাছে

---

(১) ইহা মহাকবি নবীনচন্দ্রের শেষ কথা। তিনি ইহার কিছু অংশ মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্ব্বে স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। —সম্পাদক।

(২) ইনি কবির ভ্রাতুষ্পুত্র; অশোক চন্দ্র সেন এঁর বাবার নাম। খুব সম্ভবতঃ ইনি এখন মান্দালেতে আছেন। বার্ম্মা গভর্ণমেণ্টের টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টে ইনি কাজ করেন।

(৩) প্রাণকুমার সেন মহাশয়ের ছেলে; এঁর আসল নাম চঞ্চলকুমার সেন। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

(৪) কবির সম্পর্কে ভাই।

(৫) রমেশ পুরোহিত —চট্টগ্রাম জর্জ্জ কোর্টের উকিল।

আমার একমাত্র ভিক্ষা (৬)..................সংসার চালাইবে। স্ত্রী ও রমেশের কাছে আমার একমাত্র ভিক্ষা যে অভিমান ও জিদ উহা আমার চিতায় ভস্মীভূত করিবে। সকলেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। এবং এই সংসারের দ্বারা......(৭)

১১। লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের হইতে যে টাকা পাইবে, তাহার......দ্বারা পাহাড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিবে ও অন্যান্য ঘর মেরামত করিবে ও জমিদারীর আয়ের দ্বারা সংসার চালাইবে ও বাকী টাকা দ্বারা সংসার চালাইবে ও সকলে এখন যে ভাবে আছে সে ভাবে চালাইবে। ভাগ করিলে কোনমতে এ সংসার রক্ষা হইবে না। ঝগড়া বিবাদ না করিয়া তাহাতে জমিদারীর টাকা ও ধানের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিবে। পূর্ব্ব জমিদারীর আয় দ্বারা সকল প্রতিপালন হইতে পারে—সকলে মিলিয়া তাহা করিবা। আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা দ্বারা......বশীভূত হইয়া কেবল কাটাকাটি......করিবে না। যাহাতে সংসার চলে কেবল অভিমান না করিয়া কার্য করিবা ও সংসার চালাইবা। কথায় কথায় কাটাকাটি করিবে না।......বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। অথচ অভিমান গগনস্পর্শী। সকলেই বিবেচনা করে আমি একজন বুদ্ধিমান্। কেবল এইমাত্র। এই কেবল......তথাচ কাহারও কিছু বুদ্ধি নাই। কেবল লড়াই। ও আত্মীয়গণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। মন দৃঢ় রাখিবে। কেবল হামবরা হামবরা করিয়া কার্য করিবে না। কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য না করিবা। রমেশ ও নগেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিবা। সকলই সমান গাধা। অথচ সকলই মনে করে আমি একজন অতি বুদ্ধিমান্।

(৬) এতদূর পর্য্যন্ত কবিবরের নিজের হাতের লেখা। ইহার পরবর্ত্তী অংশ কবির কথামত অন্য দুই ব্যক্তি লিখিয়াছেন। (৭) এর পরের কিছু অংশ পাওয়া যায় নাই।

নবীনচন্দ্র সেনের কতিপয় অপ্রকাশিত কবিতা।

মন বল আর কি ভাবনা?

মন বল আর কি ভাবনা?
তোর ফুরাল সাহেব ভজনা।
চাকরি ছেড়ে যেতে কি মন
তোর এত মন বেদনা?

এ যে জগত ছেড়ে যেতে হবে
কর এবে তার ভাবনা
ইংরাজেরো রাজা' যিনি
তাঁর রাজ্যে মন চল না
(তাঁর চাকরি মন করনা)

তিনি কীট পতঙ্গে যোগান অন্ন,
নিরন্ন তুমি রবে না
খোসামুদি জুয়াচুরি হিত
হিংসা দ্বেষ প্রবঞ্চনা,
এ পাপ নাহি সেই রাজ্যে
মা আমার চুকলি শুনে না।
মা আমার আনন্দময়ী
মন তুমি কি তা জান না
(মনরে। নবীন কহে জয় কালী বল,
আনন্দে ঘুচিল মোর লাঞ্ছনা।
(ও মন সাহেব সেবা এ লাঞ্ছনা।)

আংকেলের পত্র (১)

সাহেব বাচ্চা "হলে কি মা! এমন পাষাণ হতে হয়?
কতদিন গিয়েছিস মা? ছেলে কি তোর কেউ নয়?
তোর ক্ষুদে বুকখানি ছিল স্নেহে টক্ টক্,
জব্বলপুরে গিয়ে কি মা! হইলি পাষাণ ব্লক'?
আমি কাঁদি " মা মা " বলি; তোর মা " খালাস " করে খানা
এসো বেঙ্কো বিবি সেজে খাচ্ছে হাওয়া বিবিয়ানা ।
জব্বলপুরের হাওয়া এবার করিবে নালিশ জব্বর,
এত হাওয়া খেলে, তার থাকবে না যে চালের খড় ।
গিয়েছিলি কি নর্ম্মদায়, দেখেছিস কি জলধারা?
নীলজলে দেখেছিস কি খেলিতেছে কি ফোয়ারা?
বহিছে নর্ম্মদা যথা মর্ম্মরের মাঝ খানে,
বহিবি তেমতি মা গো! সংসার পাষাণ প্রাণে?
আমার নির্ম্মলা মা তেমতি শান্ত শীতলা,
বহিবে ফোয়ারা খেলি স্নেহের সুধা নির্ম্মলা ।
নির্ম্মলা নর্ম্মদামত, এই আশীর্ব্বাদ করি,
বহিবি সংসার শৈলে সুধাময়ী রূপ ধরি ।
ছি ছি জেটি, মিলি মাসী, বাঘের পিসি বাঘের মাসী,
তাহাদেরে দিবি আমার আদর মা! এক রাশি ।
বলিস ভুলেছি ঝগড়া হয়েছি মা ছেলে ভাল,
ধরিয়াছি হেট্-কোট বি এ মহল করবো আলো ।

নবীনচন্দ্রের পত্নীর বহস্তে লিখিত । খুব সম্ভবতঃ, পত্রখানা শ্রীমতী সাধনা বসুর মাতা মিসেস্ সরল সেনকে লিখিত হয়েছিল ।

(গুরুমাকে)

গুরুমাকে বলবি তাঁর আড্ডা; ইন্টার মিডিয়েট,

নিত্য দণ্ডবৎ করি কালামুণ্ড করি হেট।

সেলাম করি দেখিলে মা পশ্চাতে কুঞ্চিতা সাড়ি।

ভাবি মনে ইনস্ আল্লা! কাজি মোল্লার পাকা দাড়ি।

(তোর) খোঁড়া বাপকে, ক্ষুদে মাকে, দিবি স্নেহ সবিশেষ।

এইখানে এ বাঙ্গালি আক্কেলের পত্র শেষ।

ইতি জব্বলপুরের হাওয়া ভক্ষণ পর্ব্বের
আক্কেলের পত্র নামক মহাকাব্য।

অন্তিম আশা

না চাহি সমাধি উচ্চ মর্ম্মর গৌরব—

প্রতিকৃতি প্রতিমূর্ত্তি নগর-প্রাসাদে,

কিংবা রাজ-পথ-পার্শ্বে—বায়স বিভব।

দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠে গোরাচাঁদ কাঁধে।

… … … নরহন্তা, পরস্ব-হারক

দুর্ব্বল দলনকারী, পাদুকাবাহক

সবলের, দেশদ্রোহী প্রবঞ্চক

সারমেয়গণ তরে বিশ্বাস ঘাতক।

মা! তোর সঙ্কীর্ণ কুঞ্জে যথা পিকগণ

ভারতের গাইতেছে অমৃত ধারায়

সুশীতল, বহিতেছে শান্তি সমীরণ,

তাহার শ্যামল তৃণ নিভৃত কোণায়

দরিদ্র নবীন কবি ক্ষুদ্র স্থান চায়।

অন্তিম-আশা

নাচাহি সমাধি-উচ্চ মর্ম্মর সৌধ—
প্রতিকৃতি প্রতি মূর্তি নগর প্রাসাদে,
কিম্বা রাজ পথ পার্শ্বে—বায়স বিভব।
দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠে পোরা চাঁদ ফাঁদে।
আবৃত্তকা; নর হন্তা, পরস্ব হারক,
দুর্ব্বল দমন কারী, পাদুকা বাহক
সবলের, দেশ দ্রোহী প্রবঞ্চক—
সারমেয় সনে তবে বিশ্বাস ঘাতক।
মা! তোর সংকীর্ণ কুঞ্জে যথা শিবপুরী
দিকসনে—
ভারতের গাইতেছে অমৃত মাধুরী
সুশীতল, বহিতেছে শান্তি সমীরণ;
তাহার শ্যামল বুকে নিভৃত কোণায়
দরিদ্র নবীন কবি ক্ষুদ্র স্থান চায়।

নবীনচন্দ্রের পত্নী লক্ষ্মী দেবীর স্বহস্ত-লিপি।

বঙ্গরত্ন কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের
শারদীয়া পূজার গান।

১। **দুর্গোৎসব কীর্ত্তন**

মূলতান তাল আড়া ঠেকা

দেখে আয় তোরা হিমালয়ে ওকি আলো ভাসেরে

এ নহে অরুণ আভা
এ নহে শশাঙ্ক বিভা,
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর গৌর আভা হাসেরে।

শারদ শশী বঙ্কিম
করি ওই আভাহীন
পশ্চিম গগনে ওই উমামুখ ভাসেরে।

বাজারে বোধন আরতি
আসিছে আমার পার্ব্বতী
জুড়াতে মায়েরি প্রাণ উমা আমার আসেরে।
বৎসর অন্তরে আজি উমা আমার আসেরে॥

প্রভাতী সপ্তমী উষা

বিভাস কাওয়ালী

উঠ উঠ পুরবাসী　　শারদ সপ্তমী
পোহাইল কর দরশন।
পূরব গগনে　　অরুণ আননে
দেখ উষা হাসিছে কেমন॥

বৎসর অন্তরে　　দুঃখিনী বঙ্গ ঘরে
উমা করিলেন আগমন।
নয়ন ভরিয়ে　　দেখনা আসিয়ে
প্রেম-পূর্ণ মায়েরি বদন॥

বাজাও আরতি　　প্রেম আনন্দে মাতি
প্রেম অশ্রু করি বরিষণ।
এস মা এস মা এস　　দীন আলয়ে এস
প্রাণ ভরি পূজিব চরণ॥

হৃদয়ে রাখিয়ে　　নয়ন ভরিয়ে
নিরখিব রাতুল চরণ।
প্রেম অশ্রু বরষিয়ে　　চরণ প্রক্ষালিয়ে
জুড়াইব তাপিত জীবন॥

একটি বৎসর　　কত দুঃখ নিরন্তর
সহিয়াছি কহিব এখন।
প্রাণ জুড়াইব　　বুকে মুখ রাখিব
সব দুঃখ হবে নিবারণ॥

৩। **সপ্তমী পূজা**

বিভাস ঝাপতাল।

এস মা আনন্দময়ী এস মা গৃহে আমার
রাঙ্গা পায়ে আলো করি মাগো অখিল সংসার ॥
কি আছে আমার ওমা! করিব পূজা তোমার।
লও তৃণ ফুল জল প্রেম অশ্রু উপহার ॥

লও সুখে লও দুঃখে চির ভক্তি পুষ্পহার।
জীবের জননী তুমি, তুমি সর্ব্ব জীবাধার ॥
জীব বলি নহে পূজা স্নেহময়ী মা তোমার।
লও কাম ক্রোধ বলি ছয় রিপু দুর্ণিবার ॥

আরতি

ঝিঁঝিট খাম্বাজ খেমটা

গাও সপ্তমী আরতি গাও জয় দুর্গা জয়
ওরে দুর্গা নামে নাহি থাকে রোগ শোক দুঃখ ভয় ॥
আনন্দময়ী জননী
আনন্দময়ী রজনী
হাসে ধরা নব শ্যাম শস্য শোভিনী
হাসে পদ্ম বন নদী আনন্দে উছলি বয় ॥
মায়ের ত্রিনেত্রে ত্রিকাল
অঙ্কে শক্তি সুবিশাল
দশভুজ দশদিক্ সপদ্ম মৃণাল
মায়ের পদতলে পশুবল শিরে যোগ জ্ঞানময় ॥

সরস্বতী নির্ম্মলা
স্বর্ণলক্ষ্মী চঞ্চলা
শোভিছে দুই কন্যারূপে অতুলা
শোভে কার্ত্তিক গণেশ পুত্র সিদ্ধিবীর্য্য শোভাময় ॥

আহা মানব আমার
কিবা আছে পূজিবার
(বিনা) শক্তি, বিদ্যা, ধন, জ্ঞান, বীর্য্য, সিদ্ধি আর
বিনা সুখপ্রদ মায়ের রাতুল চরণদ্বয়
(ওরে) কাম হতে নিষ্কামের কি প্রতিমা জ্ঞানময় ॥

৫। *নিশা পূজা

ভৈরবী আড়া ঠেকা

নীরব নিশীথে পূজিব তোমায়।
প্রাণ জবা দিয়ে রাঙ্গা পায় ॥

দিবসের কোলাহল
বিষয়ের হলাহল
নিবিয়াছে সহস্র শিখায়।

নিদ্রিত ধরার বুকে
জোৎস্না ঘুমায় সুখে
শান্তি বরষি ধরায়।

এনেছি নিদ্রিত ধরি
এক নহে ছয় অরি
জ্ঞানপাশে বাঁধিয়া সবায়।

দেও বৈরাগ্যের অসি
দেও ভক্তি হৃদে বসি
লও ছয় শত্রু বলি পায় ॥

৬। তুই মা আসিলি আবার
কোথা রেখে এলি সে মা দুঃখিনী আমার,
কোথা রৈল বাবা আমার, সেই প্রেম পারাবার।
খুলিয়া তোর স্বর্গের দ্বার দেখা একবার ॥
এই নিশা পূজাকালে, বসিয়ে মায়েরি কোলে,
দেখিতাম তোর মুখ মহিমা আধার।
বসি পিতা যোগিবেশে, গাইতেন কি উচ্ছ্বাসে,
তোর কি তাহা মনে ওমা, পড়ে নাকি আর?
তোর মুখে মায়ের মুখ, তোর বুকে মায়ের বুক,
তোর শিবে মিশিয়াছে শিব কি আমার।
দেখিলে মা তোর মুখ, উথলিয়া উঠে বুক,
আমার মা বাপের শোকে ঝরে অশ্রুধার।
নিয়ে কটি ফুল বুকে, তাঁরা ত মা আছেন সুখে,
আমি ত উৎসবে মাগো কাঁদি অনিবার।
কে বলে মা শোকে দুঃখ, শোকে মা "নির্ম্মল" সুখ,
এ নির্ম্মল সুখ ভিক্ষা দেও মা আমায় ॥

৭। নম নম নারায়ণী ত্রিনয়নী মা আমার,
দুর্গতিহারিণী দুর্গে! দুঃখ-সিন্ধু কর পার।
শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে মা সর্ব্বমঙ্গলাধার,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্কার।

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের তুমি মাতা মূলাধার
গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্কার।
শরণাগত দীনার্ত্ত তুমি মা কর উদ্ধার,
সর্ব্বদুঃখহরে দেবী নারায়ণী নমস্কার।
সর্ব্বরূপা সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ব শক্তি মা তোমার,
ভয়ে ত্রাণ কর দুর্গে নারায়ণী নমস্কার॥

৮। যেওনা যেওনা নবমী রজনী সন্তাপহারিণী আজি লয়ে তারাদলে.
গেলে তুমি দয়াময়ী উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান,
যাবে মেনকার প্রাণ.
প্রভাত শিশিরে আমরা ভাসাবে নয়নজলে।
প্রভাত কাকলি গান
কাঁদাবে মায়েরি প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবেরে জলে।
হৃদয়েতে মেনকার
উমা-স্নেহ পুষ্পহার.
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে।

৯। উমা আমার চলিলি এখন।
ওরে মেনকা-মার দুনয়ন,
ও বুক ফেটে যায় রে;
কোমলমুখী উমারে আমার!
তিনটা দিন বৈ মায়ের বুকে রৈলি নারে আর,
ওরে না জুড়াতে মায়ের বুক হলে উমা অদর্শন॥

ওরে ধরে রাখরে

এনে দেরে কোলেতে আমার,

লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশে একবার।

ওরে চলে যায় উমা আমার পাষাণে বাঁধিয়া মন

(ওরে চেয়ে দেখরে)

(তোরা ধরে রাখরে)

ওরে পাষাণী আমার,

পাষাণের মেয়ে ফিরে দেখ না একবার

ওরে মায়ের বুকে পাষাণ দিয়ে কেমনে যাসরে এমন

(ও বুক ফেটে যায়রে)

মেনকা মা কেঁদনাক আর

তোমার শোকে বঙ্গবাসী করে হাহাকার।

এই শোকে কাঁদিতেছে সকল সংসার,

আসিবে বৎসর পরে পাষাণী উমা এমন

ও বুক জুড়া তোর

আসিস্ মা বৎসর পরে পাষাণী উমা এমন

ও পথ চেয়ে রব।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার গান

আয় মা লক্ষ্মী হেমময়ী স্বর্ণস্বরূপিণী আয়,
স্বর্ণ করে স্বর্ণ পদে স্বর্ণপদ্ম শোভা পায়।
(আয় মা লক্ষ্মী আয় আয়রে।)
পূর্ণ শশী পূর্ণিমার
মুখশশী মা তোমার
(ওমা) শারদ জোছনা হাসি শ্যাম শস্যাম্বরা আয়।
শারদীয় পূর্ণমাসী
ছড়ায়ে রজত রাশি
ওরে ধরা মরকতময় নব শস্যে আয় মা আয়।
শারদ পূর্ণিমা মত,
ছড়াইয়া অবিরত
ওমা! অজস্র রজত রাশি অন্নদা ধনদা আয়।
বৎসর অন্তরে ধরা
করি ধন-ধান্যে ভরা
ওমা! অন্নে পূর্ণ করি ধরা অন্নপূর্ণা আয় মা আয়॥

শ্রীশ্রীকালীপূজা

কি ভীষণ রণে দেখ ত্রিভুবনে
নাচে কালী রণ-রঙ্গিণী
(কালী বল কালী বল)
নাচে কালবক্ষে কালকামিনী।

(২)

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি করে ধ্বংস অসি
ছিন্ন শির, কি রুধির—
প্লাবে নিত্য অঙ্গ প্লাবে অবনী

(৩)

দুই কর লয় দুই করাভয়
লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়
সদা শিব ঊর্দ্ধগ্রীব
দেখ ধ্বংস মূল স্থির আপনি।

(৪)

প্রকৃতি উলঙ্গ মাতা বিবসনা
ললাটে অনল অঙ্গারবরণা
চারি ভুজ চারি দিক্
(ওমা) ত্রিনেত্রে ত্রিকালদর্শিনী
(ওমা) ধ্বংসরূপে সর্ব্বব্যাপিনী
(ওরে নাচিছে রে।)

(৫)

জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা কিঙ্করী
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংসে সহচরী
অট্টহাস কি উল্লাস,
ধরা-শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী
ওরে নাচিছে রে।

(৬)

জন্মে চণ্ডমুণ্ড স্থষ্টিবিবর্ত্তনে
রক্তে পশু-বীজ রক্তবীজ সনে
কদাকার দুরাচার
নাশি স্বজনে মানব-জননী
(ওমা চামুণ্ডে মা)

(৭)

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা আসি
নাচ রক্তবীজ কামাসুর গ্রাসি
চণ্ড ক্রোধ মুণ্ড দ্বেষ
নাশি কর শুভ রাজ্য অবনী
(ডাকে নবীনে মা)

শ্রীশ্রীরাসলীলা

ওরে ব্রজবাসী আয়রে
রাসে তোরা কে নাচিবে আয়
ওরে চন্দ্র নাচে তারা নাচে ধরা নেচে নেচে যায়
(আয়রে আয় আয় তোরা আয়)

(২)

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি
গ্রহে গ্রহেতে ভাসি
উঠিছে কৃষ্ণের গীত প্রাণ উদাসী
(গীতে) বুদ্ধ নেচে গৌর নেচে গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়
হরি বলে হরি হরি বলে।

(৩)

গোপাপ্রসূত কুমার

ছাড়ে বুদ্ধ অবতার

ছাড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী শচীমা নিমাই

ওরে পতি-পুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ

আয়রে আয়

আয়রে আয় আয় তোরা আয়

পতি-পুত্রে না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায় ॥

(৪)

প্রেমে কিশোর বিহ্বল

দুই নেত্র ছল ছল

মাঝে কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল

বেড়ি নাচে, করে কর বেঁধে কৃষ্ণ সবারি গলায়

প্রেমে মাতোয়ারা আত্মহারা

নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায় ।

(৫)

প্রেমে হাসে জোছনা

প্রেমে হাসে যমুনা

প্রেমে হাসিতেছে বৃন্দাবন নাহি উপমা

ওরে নীলমণি ধরো প্রেমে যমুনা উছলি যায় ।

(৬)

আহা আছেন ঈশ্বর

বিরাজিত নিরন্তর,

সর্ব্বভূত হৃদয়েতে কৃষ্ণ রাসেশ্বর

রাসচক্রে সর্ব্বভূত নাচিয়া বেড়ায়
কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
ঘুরিছে প্রকৃতি ধীরে নেচে ধরি পুরুষ গলায়।
প্রেমের ব্রজ এ ধরা
প্রেমের গোপী আমরা
কালকালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা
(আলা) জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে ভ্রমি ভব রাস লীলায়
কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
(নাথ) নবীনের নাহি দুঃখ যদি তোমায় হৃদে পাই।

বল কৃষ্ণ বল রাসের কৃষ্ণ বল প্রাণের কৃষ্ণ বল।

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি হাসে বৃন্দাবন,
নীল যমুনায় হাসে চন্দ্রের কিরণ।

নির্জ্জন কানন বক্ষে জোছনার হাসি,
উঠিতেছে কিবা গীত! কিবা সুধারাশি।

পতি-পুত্র ছাড়ি গোপী উর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
শুনিলে সে গীত ঘরে কে থাকিতে চায়।

কৃষ্ণ কহে সতীগণ! যাও ফিরে ঘর,
পতি-পুত্র গৃহ তব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর।

গোপী কহে নাহি চাহি পতি পুত্র ঘর,
তুমি আমাদের পতি জগত ঈশ্বর।

তোমার চরণে যদি নাহি দেও স্থান,
যমুনাসলিলে আজি ত্যজিব পরাণ।

পতি-পুত্রাধিক কৃষ্ণ যারা নাহি চায়,
তাহারা'ত কৃষ্ণধনে কভু নাহি পায়।

কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন গোপীর অভিমান
হইল, হইলা কৃষ্ণ ধীরে অন্তর্ধান।

নাহি থাকে প্রেম, তথা যথা অভিমান,
প্রেমের কৃষ্ণ সে'খানে নাহি পায় স্থান।

কৃষ্ণ হারাইয়া'তবে কাঁদে গোপীগণ,
কৃষ্ণহারা কাঁদিলেন গৌরাঙ্গ যেমন।

আত্মহারা গোপীগণ প্রাণ কৃষ্ণময়,
ভ্রমে বনে বনে করি কৃষ্ণ অভিনয়।

ভক্ত প্রেমিকায় কৃষ্ণ দিলা দরশন,
হরিপ্রেমে ভাসিতেছে হরির নয়ন।

আপনি কিশোর কৃষ্ণ প্রেমেতে বিহ্বল,
বেড়িয়া বিহ্বলা গোপী নাচে অবিরল।

নাহি লজ্জা নাহি জ্ঞান নাহি বক্ষোবাস;
নাচিতেছে, করে কর প্রেমের উচ্ছ্বাস।

সকলে দেখিছে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া পাশে,
গলায় ধরিয়া নাচে প্রেমের উচ্ছ্বাসে।

প্রেমাবেশে উঠে পরে গড়াগড়ি যায়,
নাচিয়া গাহিয়া কাঁদে প্রেমে উভরায়।

নাচে প্রেমে বৃন্দাবন নাচে তারাদল,
নাচে প্রেমে চন্দ্রালোক যমুনার জল॥

শ্রীশ্রীদোলযাত্রা

চল নেচে নেচে নেচে ভাই! প্রাণের গোবিন্দে দোলাই
অন্তর বাহিরে দোল, দোলময় সর্ব্ব ঠাঁই।

কিবা মধুযামিনী,
কিবা চারুহাসিনী,
দোলে নীলাকাশে নিশামণি দোলে নীলমণি
সবে হরি হরি হরি বল আনন্দের আর সীমা নাই

সংসার-শ্রীবৃন্দাবনে
পুরুষ-প্রকৃতি সনে
সৃজন পালন মাঝে দুলিছে সদাই;
সবে ভবলীলা দোল-খেলা চল দেখে প্রাণ জুড়াই।

দেহ বিচিত্র দোলায়
জন্ম মৃত্যু দু-সীমায়,
আহা জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে দুলিছে সবাই
সবে ভবলীলা দোল-খেলা চল দেখে প্রাণ জুড়াই
আহা হরি হরি হরি বলে চল সবে দুলে যাই।

দেখ ত্রিগুণ ত্রিভিত
উর্দ্ধে ত্রিগুণ মিশ্রিত
দোলায় দুলিছে ওই ত্রিগুণ অতীত
তম রজ সত্বে উঠি চল চিদানন্দে যাই
দিও নবীনে নির্ম্মলে নাথ! চরণ-দোলায় ঠাঁই॥

—

(১)

আবির কুঁমকুম খেলিতে খেলিতে
নাচিছে কিশোর কিশোরী সহিতে।

(২)

বসন্ত মলয় বহে মধুময়
গাহিছে কোকিল পঞ্চমে রে
হাসিছে প্রকৃতি, সিমুলে পলাশে
আবির কুমকুম খেলিতে খেলিতে।

(৩)

কিশোর কিশোরী বলি হরি হরি
করিতেছে কেলি পুলিনেরে
হাসিছে গাহিছে নাচিছে চুমিছে
ফাগুনে ফাগুয়া খেলিতে খেলিতে।

(৪)

রাঙ্গা বৃন্দাবন রাঙ্গা সখীগণ
রাঙ্গা রাধাশ্যাম দুলিছে রে
রাঙ্গা শুক-শারী ময়ূর-ময়ূরী
বহিছে যমুনা নাচিতে নাচিতে॥

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

আয় মা দেবী সরস্বতী ! জ্ঞানস্বরূপিণী আয়।
ওমা নির্ম্মল আলোকে ধরা আলোকিয়া আয় মা আয়।
বসন্ত পঞ্চমী আভা
অঙ্গে তব মনোলোভা
নব কিশলয় শোভা করে পদে শোভা পায়।
তরুণ সকলি ইন্দু শুভ্র কান্তি আয় মা আয় ॥
জ্ঞানপদ্ম নিরমল
শ্বেতদল শতদল
শোভতেছে পদতলে শ্বেতাঙ্গ-বাসিনী আয়
সকল বিভব সিদ্ধি আয় মা ভারতী আয় ॥
এক করে পুস্তক যার
অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার
শোভে অন্য করে বীণা বীণাপাণি আয় মা আয়
সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প প্রসবিনী আয় মা আয়।
ভারতে মা কত কাল
জ্ঞানপূর্ণ সুবিশাল
খোলেনি সে মহাগ্রন্থ বাজে নি সে বীণা হায় !
আর কি খুলিবেনা কভু
আর কি বাজিবেনা হায় !
এ হেমন্ত করি অন্ত
সঞ্চারি নব বসন্ত
খুলিয়া তোর মহাগ্রন্থ বীণা বাজাইয়া আয়
হৃদয় বাসন্তি পুষ্পে চরণ পূজিব আয় ॥

[গৌরী-বন্দনা]

(১)

(ওমা) গৌরি আমার গৌর হ'লি,
পতিত মায়ায় এসে নদীয়ায়
পাষাণি ! পাষাণ প্রেমে গলাইলি।
রাজ আভরণ করিয়ে মোচন
গৌর অঙ্গে ভস্ম করিয়া লেপন
(ওমা) পাশাঙ্কুশ ছাড়ি কমণ্ডলু ধরি
দানবদলনি প্রেম বিলাইলি।

(২)

কৈলাসবাসিনী হ'লি বিন্ধ্যাচলবাসী
মহেশমহিষী হইলি সন্ন্যাসী
অন্নপূর্ণা মাগো প্রেমাশ্রু বরষি
পতিতের প্রেম-পিপাসা পূরালি
"নবীনের" প্রেম-পিপাসা পূরালি।
পড়েছি ভব-সাগরে দেগো মা চরণতরী
বিষয়বাসনা ঝড় বহিছে গর্জ্জন করি
কিবা মোহ অন্ধকার
কি তরঙ্গ অবস্থার
কামস্রোত দুর্ণিবার ভাসি তৃণ মত পরি
তবু নাহি ভয় করি
জননী আমার শঙ্করী
পদতরী ভর করি যাব মা তরি'।

ধরিয়ে ভক্তির হাল
উড়ায়ে প্রীতির দান
নবীনে মা দিবে পারি' নির্ম্মলে হৃদয়ে ধরি।

(৩)

কৈ হে গিরি ! উমা এল না
উমা এলো না উমা এলো না
আমার উমা এলো না।

(৪)

মায়ের প্রাণ ত তুমি বুঝ না
তুমি বুঝ না—তুমি বুঝ না
মায়ের প্রাণ আর বাঁচে না
আর বাঁচে না আর বাঁচে না
বল না সখী কোথায় জুড়াব এই প্রাণ
কোথায় জুড়াব এই প্রাণ।
যমুনারি জল জলন্ত অনল
চাঁদ চাহিনে কাঁদে প্রাণ।

[বিরহ]

(১)

আমি তারে পাব কেমনে
সে আমার প্রাণে মরমে
যে দিকে নিরখি
তার মুখ দেখি
জলে স্থলে অনিলে গগনে
দেখি চন্দ্রকরে কুসুম কাননে।

বিরহ

বাজে তার বাঁশী
গ্রহে গ্রহে ভাসি
করে প্রাণ উদাসী পশি মরমে
ব্রজবালা রবে কেমনে
নবীন ঘরে রবে কেমনে।

(২)

তুমি চলে যাবে কি দুঃখ তোমারি
তৃষিত চাতকী রবে পথ চেয়ে
প্রাণ যাবে বিরহে তোমারি।

(৩)

চল সখি চল বনে চল দেখিগে কুসুমগণে
ফুটিছে জাতি যুথী কিবা দুলিছে সমীরণে
মৃদুল সমীরে
শীতল শিশিরে
বরষিয়া অশ্রু ধীরে কারে নমিছে মনে মনে

(৪)

তুমি তারে দিওনারে মন
সে ত তোমার হবে না আপন
তুমি ভাব সে তোমার
সে ত মনে ভাবে আর
তার তরে কেন কাঁদ অকারণ।

(৫)

কি সুখের যামিনী
হাসিছে প্রকৃতি কুসুম মালিনী

নির্ম্মল আকাশে
শশধর ভাসে
হাসেন হরি রাসে হাসে অবনী
হাসে গোপিনী।

(৬)

দিবানিশি মন উদাসী ভাবি যাহারে,
সে ত কভু মনে নাহি করে আমারে।
তারি তরে কাঁদিছে প্রাণ সে ত চাহেনা আমারে
তবু কেন পোড়া মন চাহে তাহারে।

[শুভ-সম্মেলন]

(১)

দেও মা আনন্দময়ী দেও মা চরণাশ্রয়
দেও মা সর্ব্বমঙ্গলা শুভপরিণয়-মালা
গাঁথিয়া মঙ্গল করে দেও গলে শুভক্ষণে।
সংসার বিঘ্নসাগরে রাখিও অভয় করে
বরষি বরদকরে সুখ শান্তি স্নেহ মনে
যেন কর্ণফুলী মত বহে সুখ স্রোত শত
দীনা জন্মভূমি বক্ষে এই শুভ সম্মিলনে।
গঙ্গা যমুনার মত হয় যেন পরিণত
এ মিলন মহাতীর্থে এই ভিক্ষা ও-চরণে
রোগ শোক দুঃখ ভার হরি পার্ব্বতী মাতার
বহে যেন অনিবার প্রেম সাগর সঙ্গমে।

(২)

লও মা মঙ্গল ডালা লও মা মঙ্গল মালা
গাঁথিয়াছি পারিজাতে সিক্ত মন্দাকিনী জলে।
প্রেম-সূত্রে এ-মালার সুখ শান্তি পুষ্পহার
গেঁথেছি অনন্ত সূত্রে গেঁথেছি অনন্ত ফুলে।
কীর্ত্তি তার সুসৌরভ পুণ্য তার সুধাসর
চর্চ্চিত চন্দনে মম চির কৃপা হে সরলে।
এই মালা পরাইয়া পারিজাত বরষিয়া
বাঁধি চির প্রেম-হারে বসাইও মম কোলে।
অভয় বরদ কর রাখি শিরে নিরন্তর
রাখিব মায়ের মত চোখে চোখে গলে গলে।

[শুভ-কামনা]

(ওগো) যাও শুভক্ষণে শুভ সমীরণে
নাচিছে তরণী সাগরে
লেখ হৃদয়ে ভরসা শিরে নারায়ণ
জীবনের ব্রত অন্তরে।

(ওগো) নাহি ফলে সাধনায় নাহি হেন কাজ
অমরত্ব মিলে সাধনে
দেখ শ্রমসফলতা সুবর্ণ অক্ষরে
অঙ্কিত মানব জীবনে।

এ কবিতা কবির পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের বিলাত যাত্রা সময়ে রচিত হয়েছিল।

(ওগো) পিতার আশীষ, মায়ের মমতা
বালিকার প্রেম অমৃত
রক্ষিবে তোমারে বিদেশে বিপদে
কবচের মত সতত।

(ওগো) যদি প্রলোভন করে আকর্ষণ
ঠেলে পাপ পথে তোমারে
তুমি মনে করো অশ্রু পিতার মাতার
(তোমার) আশ্রয়—বিহীনা লতারে।

(ওগো) এই তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর মত
বহিবে নীরবে অঝোরে
তুমি জয়মালা পরি আসি মুছাইও
জুড়াইও প্রাণ আদরে।

পরিবর্তিত ভাবে "আমার জীবন"-এর ৫ম ভাগে প্রকাশিত।

[জননী চট্টলা]

ভৈরবী একতালা

মা মা মা কত কাল পরে
ডাকিলাম মাগো পরাণ ভরে
শৈলকিরীটিনী
সাগরকুন্তলা
সরিৎমালিনী, দেখিলাম তোরে।

যৌবন প্রথমে

সেই রক্তে শ্যামা

পূজিলাম পদ সেই রক্তে ওমা

জীবনসন্ধ্যায় কোথায় বল মা

পাব মা পার্ব্বতী হৃদয়-নির্ঝরে।

হৃদে নাহি রক্ত

আছে নেত্রে জল

প্রেমে বিগলিত পবিত্র শীতল

আশা বরষিয়া পদে অবিরল

ঘুমাইব মাগো চিরদিন তরে।

বসি সিন্ধু-কূলে

বিন্ধ্যাচল-শিরে

যমুনার তটে জাহ্নবীর তীরে

ভাবিয়াছি তোরে ভাসি অশ্রুনীরে

ডাকিয়াছি ওমা দেশ দেশান্তরে।

নাহি জুড়াইল

তাপিত পরাণ

রাখি বুকে মুখ, প্রেম করি পান

তৃষিত চাতক এসেছে সন্তান

জুড়াইতে প্রাণ দুদিনের তরে

পরিবর্তিত ভাবে "আমার জীবন"-এর ৫ম ভাগে প্রকাশিত।

[প্রার্থনা]

ভৈরবী ঝাপতাল

এস মা আনন্দময়ী এস মা গৃহে আমার
রাঙ্গা পায়ে আলো করি মাগো অখিল সংসার।

কি আছে আমার ও মা
করিব পূজা তোমার
লও তৃণ ফুল জল প্রেম অশ্রু উপহার
লও সুখে লও দুঃখে চির ভক্তি পুষ্পহার।

জীবের জননী তুমি
তুমি সর্ব্ব জীবাধার
জীব বলি নহে পূজা স্নেহময়ী মা তোমার
লও কাম ক্রোধ বলি ছয় রিপু দুর্ণিবার।

গোষ্ঠ

(১)

উঠ নীলমণি পোহাইল রজনী
বেলা হল গগনে।
রাখালের সহিতে, নাচিতে নাচিতে,
করে যাওরে বংশীর ধ্বনি।
(গোপাল—গোপাল রে)
পর পীতধড়া মাথায় মোহন চূড়া
বেঁধে দি মাথায় বেণী।

কয়েতে পাচনি লও নীলমণি,
দেখিতে এল সব গোপিনী।
যতেক রাখাল আসি দাঁড়াইল
চাহিতে তোমার পানে।

---

(১)

সাজায়ে দেও ভাই কানাইরে নিয়ে গোষ্ঠে যাই।
পন্থপানে চেয়ে আছে ধবলী গাই॥

(২)

মাগো! বলি আমি বিনয় করি (যশোদা যশোদে মা
সাজায়ে দে বংশীধারী,
কাঁধে করে নিতে কানু কত সুখ পাই।
কিবা যাদু কানু জানে বেণুর স্বরে ফিরে ধেনু,
বিষের জ্বালায় জ্বলি যবে প্রাণ বাঁচায় ভাই।
বিনে সেই জীবন কানু কে বাজাবে মোহন বেণু
সঙ্গে চলে জীবন কানু কারে বা ডরাই।

(৩)

তোমরা সব রাখালে যাওরে চলে
আমি আজ গোষ্ঠে যাব না।
কানাই বলে বলাই দাদা আর সে কথা কওনা॥
আমার মা যে নন্দরাণী বড় দুঃখিনী
মা বলিতে লক্ষ্য নাই আমি মার একা নীলমণি।
ওগো! "নীলমণি নীলমণি" বলে (ওরে বলাই…)
মা ত প্রাণে বাঁচবে না।

ড়া চূড়া বেঁধে মাথায় বসে রয়েছি (গহন বনে যাব বলে)
মা আমায় দেয় না বিদায়
এখন উপায় করি কি!
মাঠে গেছে পিতা নন্দ, সেও বিদায় দিল না।

---

(১)
কেন কানাই গোচারণে যাবি নে?
(কেন যাবি নে, যাবি নে)
ধবলী শ্যামলী গাভী চেয়ে আছে পথ পানে।

(২)
গোষ্ঠে যেতে নীলমণি বিদায় দেও মা নন্দরাণী,
(কানাইরে! বিনে কানাই কানাই)
নিত্য নিত্য আমরা যেতে পারি নে।
চূড়া বেঁধে হার গলায় দে
কেন মা বিনে তুই যাবি নে?

(৩)
আনিয়া শীতল জল, তুলিয়া বনের ফল,
কানাই খাবে বলে রাখি যতনে,
কেবল খেতে খেতে মিলে যাব
তুলে দি চাঁদ বদনে।

(৪)
কাঁধে করি, কাঁধে চড়ি, শুনরে ভাই নীলমণি,
ঠাকুর বলে কখন জানি নে।
ব্রজের রাখাল রাখাল সবাই করি
বসলে সিংহাসনে।

---

(১)

ভাইরে কানাই তুই নাকি ভাই বৈষ্ণ হলি
  কাল রূপ কারে দিলি ?
ও তুই যশোদাকে ত্যজ্য করে শচী মাকে মা বলিলি
  তুই যশোদাকে মা বলি দুঃখ সাগরে ভাসাইলি।

(২)

ধড়া চূড়া ত্যজ্য করে নামাবলি সার করিলি
  রাধার ঋণ শুধবি বলে নবদ্বীপে উদয় হলি ?
ও তোর মোহন বাঁশী ত্যজ্য করে দণ্ড কমণ্ডলু নিলি
  ও তোর চিহ্ন আছে নয়ন বাঁকা, দেখা দেরে বনমালি।

কুরুক্ষেত্র।

(১)

হে কৃষ্ণ! কেশব! হরে!
অনাথনাথ দীনবন্ধু! করুণাসিন্ধু! মুরারে!
সংসার জীবন, দেখ সাঙ্গ হলো আমার
  হেরি তোমার কর্ম্ম প্রাণ সঁপেছি
এই অবলা বালিকা রৈল স্থান দিও চরণে তারে।

(২)

আজি এই অনাথা,
পাইল বিষম ব্যথা
হাসি কথা বিনে কিছু জানতো না।
কোমল কুসুম হৃদি,
কেন দুঃখ দিলে বিধি ?
নিরবধি আনন্দ কি রয় না ?

ধড়া চূড়া বেঁধে মাথায় বসে রয়েছি (গহন বনে যাব বলে)
মা আমায় দেয় না বিদায়
এখন উপায় করি কি!
মাঠে গেছে পিতা নন্দ, সেও বিদায় দিল না।

---

(১)
কেন কানাই গোচারণে যাবি নে?
(কেন যাবি নে, যাবি নে)
ধবলী শ্যামলী গাভী চেয়ে আছে পথ পানে।

(২)
গোষ্ঠে যেতে নীলমণি বিদায় দেও মা নন্দরাণী,
(কানাইরে! বিনে কানাই কানাই)
নিত্য নিত্য আমরা যেতে পারি নে।
চূড়া বেঁধে হার গলায় দে
কেন মা বিনে তুই যাবি নে?

(৩)
আনিয়া শীতল জল, তুলিয়া বনের ফল,
কানাই খাবে বলে রাখি যতনে,
কেবল খেতে খেতে মিলে যাব
তুলে দি চাঁদ বদনে।

(৪)
কাঁধে করি, কাঁধে চড়ি, শুনরে ভাই নীলমণি,
ঠাকুর বলে কখন জানি নে।
ব্রজের রাখাল রাখাল সবাই করি
বসলে সিংহাসনে।

---

(১)

ভাইরে কানাই তুই নাকি ভাই বৈষ্ণ হলি
কাল রূপ কারে দিলি ?
ও তুই যশোদাকে ত্যজ্য করে শচী মাকে মা বলিলি
তুই যশোদাকে মা বলি দুঃখ সাগরে ভাসাইলি।

(২)

ধড়া চূড়া ত্যজ্য করে নামাবলি সার করিলি
রাধার ঋণ শুধবি বলে নবদ্বীপে উদয় হলি ?
ও তোর মোহন বাঁশী ত্যজ্য করে দণ্ড কমণ্ডলু নিলি
ও তোর চিহ্ন আছে নয়ন বাঁকা, দেখা দেরে বনমালি।

কুরুক্ষেত্র।

(১)

হে কৃষ্ণ! কেশব! হরে!
অনাথনাথ দীনবন্ধু! করুণাসিন্ধু! মুরারে!
সংসার জীবন, দেখ সাজ হলো আমার
হেরি তোমার কর্ম্ম প্রাণ সঁপেছি
এই অবলা বালিকা রৈল স্থান দিও চরণে তারে।

(২)

আজি এই অনাথা,
পাইল বিষম ব্যথা
হাসি কথা বিনে কিছু জানতো না।
কোমল কুসুম হৃদি,
কেন দুঃখ দিলে বিধি ?
নিরবধি আনন্দ কি রয় না ?

(৩)

দেখলো উত্তরে আমার

কাঁদে হৃদি মরমাধার ?

এমন সজল নয়নে তুমি থেকো না !

পুতুল সাজায়ে থাক খেলা লয়ে, তুমি কেঁদ না।

আমি আসিব—আসিব—আসিব তুমি কেঁদ না।

পুতুল সাজায়ে যাক খেলা লয়ে, তুমি কেঁদ না।

আমি যাই—যাই—যাই, তুমি কেঁদ না।

(৪)

আরো বলি শুন সতি।

মা আমার করুণাবতী,

কাছে থেকো মা যেন কাঁদে না।

(৫)

বিদায় সাঙ্গ হলো,

হরি! দেও আমায় পথের সম্বল।

(হরি! তোমার কর্ম্মে প্রাণ সঁপেছি)

এ অনাথা বালিকা রৈল স্থান দিও চরণে তারে।

---

(১)

আজি সাঙ্গ হলোরে আমার জীবন !

অকুল সাগরে কাল নীরে, ধীরে নিমগন !

আমার আমিত্ব লয়ে,

চলিলাম বিদায় হয়ে,

বিস্মৃতির কাল নীরে হইব মগন,—

যেমন জলে হয়, জলে রয়, জলে লয় বিম্ব যেমন।

(২)

পাণ্ডব শিবিরে সুত! যেয়ো যেয়ো ফিরে!

দেখো পাণ্ডবের তেজ না ভেসে যায় আঁখিনীরে।

৪

৫

নবীনচন্দ্রের পরিণত বয়সের হস্তাক্ষর।

আমার, মরণ-কথা
শুনে তাঁরা পাবেন ব্যথা,
বলো আমি দিয়েছি প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তরে।
বলো ভদ্রা মায়ের কাছে,
বলো অভি তোমার ভাল আছে,
সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে অভি তোমার ভাল আছে।
আমি ষোড়শ বৎসরে ষোড়শ উপচারে
পূজিনু কৃষ্ণ নিধিরে।

(৩)

অভাগিনী উত্তরাকে দিও আমার এই মালা।
সে যে হাসিতরঙ্গিণী হয় ত হাসছে এত বেলা।
*তারে খেলতে বলো পুতুল খেলা।
(আবালবৃদ্ধ সবাই খেলে)
তারে খেলতে বলো পুতুল খেলা।
খেলা সাঙ্গ হলে,
সবাই যাবে চলে
কেহ ত্বরা কেহ ধীরে।

(৪)

এস সুত! এস কাছে,
আমার অনেক কথা বলবার আছে।
হৃদয়ের গুপ্ত দ্বার কে যেন খুলেছে।
আমার এ মিনতি পদে
যেন পরম পদে,
কৃষ্ণপদে হয় রে মিলন।

পরিবর্ত্তিত ভাবে "আমার জীবন"-এর ৫ম ভাগে প্রকাশিত।

নবীনকাব্যে ব্রাহ্মণ

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ এম-এ,
চট্টগ্রাম কলেজ

নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী গীতারই বিস্তৃতি। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস রচনায় তিনি গীতাপ্রদর্শিত পথেই চলিয়াছেন। যে ধর্ম্ম গীতায় কীর্ত্তিত, সেই ধর্ম্মই তিনি এই মহাকাব্যের মধ্যে সুকৌশলে শিল্পসৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গীতায় যাহা শুধু তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, নবীনের কাব্যাবলীতে তাহা সংগ্রামময় জীবনে রূপায়িত এই নবরূপায়ণও সৃষ্টি।

এই কাব্যত্রয়ের প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান চরিত্ররূপে চিত্রিত করিবার দায়িত্বের মধ্যে কবির যে অপরিসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের মূলে শ্রীকৃষ্ণ। বেদে, উপনিষদে, গীতায় মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে, ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, শ্রীকৃষ্ণগাথা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

গৃহে গৃহে কৃষ্ণ মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে,
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, যুগ যুগান্তর ;
রোগার্ত্তের কাতর প্রার্থনায়ও কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান, কৃষ্ণপদ চিন্তন,—
কোথা ব্রজবালা কোথা বনমালা
কোথা বনমালী হরি ;

মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণ পূজা ; ভিখারী হরেকৃষ্ণ বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে, গৃহস্থ কৃষ্ণ নামোচ্চারণে ভিক্ষা প্রদান করে ; বৈষ্ণব ললাটে, কণ্ঠে উরসে, বাহুতে কৃষ্ণমূর্ত্তির ছাপ ধারণ করে ; এইভাবে সমাজের স্তরে স্তরে জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। হিন্দু বিশ্বাস করে, "মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" বলিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে

অবজ্ঞা করে তাহারা মূঢ়; আবার যাহারা তাঁহার 'অব্যয়মনুত্তমং পরং ভাবং' না জানিয়া তাঁহাকে ব্যক্তিমাপন্নং, নামরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে তাহারাও বুদ্ধিহীন। কখনও বা তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; কখনও বা তিনি সগুণ কার্য্য ব্রহ্ম; আবার তিনি মানুষরূপে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি বিবিধ ভাবের প্রেরণায় বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন প্রাণের সহিত সংযুক্ত। বঙ্গের অদ্বিতীয় চিন্তাবীর মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপাসক হইয়াও তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থেই পরিসমাপ্তি-কালে কৃষ্ণরূপী সগুণ ব্রহ্মের অপ্রতিরোধনীয় প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন:—

বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাৎ অরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাৎ অরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

পক্ষান্তরে কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতীয় কাব্যে উপমা অলঙ্কারেও শ্রীকৃষ্ণ ওতপ্রোত। তবুও কবি যে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কাব্যত্রয় রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস ও দুর্জ্জয় সৃজনী প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর।

মিল্টন বাইবেলকে তাঁহার মহাকাব্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে স্বয়ং ভগবানই প্রধান নায়ক। বাইবেলে সুপ্রতিষ্ঠিত ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মহাকাব্যদ্বয় স্ফুরিত হইয়াছিল। কিন্তু মিল্টনের চরিত্রাবলীতে যে অতিমানুষিকতা বিদ্যমান, যে সকল অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত, শুধু তাহা মানব-মনে কাব্যরূপে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে

না। কিন্তু সেই সকল চরিত্র ও ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের, জীবনের এবং জগদতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সত্যসন্ধানকে এমন রসপূর্ণ কাব্যমন্ত্রে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে সেই সত্যের অমোঘ স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ তাঁহার প্রতিভা কালবক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত। চরিত্র-বিবর্ত্তনেও মিল্টনের কাব্যে এক অপূর্ব্ব অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। ভগবানকেই প্রধান নায়করূপে চিত্রিত করিবার মহান পূত সঙ্কল্প যেন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে। সয়তান-চরিত্রের মধ্যেই তাঁহার বিপ্লবী মনের ভাবরাশি অভিব্যক্ত হইয়াছে। সয়তানের চরিত্র নানা ভাবে মিল্টনের মনের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু সয়তান মানুষ নহে, সুতরাং মানবীয় ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি সয়তানের চরিত্রে সংসাধিত হয় নাই। ভগবান এবং সয়তানের চরিত্র-অঙ্কনে মিল্টনকে তেমন কোন বিশেষ আশঙ্কার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ভগবানের চরিত্র বাইবেলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ; সয়তান ও খৃষ্টীয় শাস্ত্রে, খৃষ্টীয় আচারে, ধর্ম্মরীতি ও কাহিনীতে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তদানীন্তন প্রচলিত এক প্রকার বৈচিত্র্যহীন সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া মিল্টন উভয় চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র-অঙ্কনে কবি নবীনের সমক্ষে বহু সমস্যার, বিভীষিকার অন্ত ছিল না। ভারতীয় ধর্ম্মপদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণ একাধারে পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্মের অবতার এবং পূর্ণ মানব। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-আলোচনায় এই ত্রিবিধ ভাবেই তাঁহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য হিউম্যানিজ্‌ম্ যে-ভাবে ভারতীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিতেছিল তখন শ্রীকৃষ্ণকে শুধু-মাত্র ভগবান বা ভগবানের অবতারচ্ছলে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস যে হাস্যকর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিউম্যানিজ্‌ম্-এর প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকেও অজ্ঞানবিমূঢ়, জড়ভাববিলাসী, সঙ্কীর্ণতা-দুষ্ট, পণ্ডিতম্মন্য পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়া-

ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ মানবরূপে প্রতিপন্ন করিলেও তিনি তাঁহাকে ভগবানের অবতাররূপেই বিশ্বাস করিতেন। ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রতিষ্ঠার পরে শ্রীকৃষ্ণের নররূপায়ণ প্রচেষ্টা নবীনের পক্ষে অসীম সাহসিকতা, সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন সমালোচকের ভূমিকা। যুগে যুগে আচারবিধি ও ধর্ম্মবিধির অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের উপর বহু আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্ণধী, অপরিসীম অধ্যবসায়, অপ্রমেয় ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ, সর্ব্বোপরি অভূতপূর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞান সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে বহু শতাব্দীর অজ্ঞান ও কুসংস্কারের কালিমামুক্ত করিয়া তাঁহারই স্বাভাবিক আলোক বিভায় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন; বিস্মৃত অবহেলিত, মূর্খতামূলক বিরুদ্ধ সমালোচনায় অতি ধিকৃত, আত্মবিস্মৃত জাতির ঘনকল্মষে অনুলিপ্ত, বিদেশী পণ্ডিত বা অপণ্ডিতের অতিস্পর্ধী নিদারুণ সঙ্কীর্ণতায় কালিমাগ্রস্ত শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় জীবনের নব-অভ্যুত্থানের ঊষা সমাগমে বঙ্কিমচন্দ্র আবার স্বকীয় দিব্য মহিমায় "স্বে মহিম্নি" সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে পুনরুদ্ধার করিলেন, নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পুনঃসৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন। কোটি কোটি মানব শ্রীকৃষ্ণকে যুগে যুগে ভগবানের অবতাররূপে পূজা করিয়া আসিতেছে; আবার তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ ব্রহ্ম, ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম; তৃতীয়তঃ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত পূর্ণ মানব। এই ত্রিবিধ বিভাবের কোন একটিকে বাদ দিয়া বা কোন একটিকে খর্ব্ব করিয়া নবীনচন্দ্রের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অঙ্কন করা হইত বাতুলতা। পক্ষান্তরে এই ত্রি-বিভাবকে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া পরস্পরের প্রতি সঙ্গতিময় করতঃ, সুষ্ঠু, সুসমঞ্জস মহান শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের পূর্ণসৃষ্টি অলৌকিক

প্রতিভাসাধ্য। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয় এমন প্রতিভারই বিজয়গাথা।

রৈবতকের প্রারম্ভে বিষয় উল্লেখের সঙ্গেই তিনি সেই বিরাট সচ্চিদানন্দবিগ্রহের আভাস দিলেন। প্রভাসতীর্থ তীরে লক্ষ্মী পূর্ণিমার উষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কল্পনা-নয়নে প্রতিভাত হইল সেই বিরাট মূরতি—

নীল সিন্ধু শ্বেত বেলা ধূসর আকাশ
দেখ সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ কেমন
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে—বিরাট মূরতি!
সত্ব ব্যোম, রজঃ বেলা, তমঃ পারাপার।

এইখানেই তিনি মহাকাব্যের মূল সুরটি (keynote) গুঞ্জরিত করিলেন। যে বিরাট মূরতি তাঁহার মানসাকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাই সূচিত হইল এই কাব্যসৃষ্টির প্রথম অঙ্কে। এই ত্রিগুণের আধারভূত যে মহান পুরুষের বিভূতি বৈচিত্র্য কবির ধ্যান নেত্রে পরিস্ফুট হইল, তাহা শুধু তাঁহারই মানস কল্পিত রূপ নহে। পূর্ব্ব সূরিগণের পথে তিনি চলিয়াছেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

"সাত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব—এই সকল আমা হইতে জাত, কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি, কিন্তু সে সকল আমাতে আছে। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে; এই সকলের অতীতে অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট নিজে গুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও তিনি যে তাহার ও উর্দ্ধে অবস্থিত, তাহাই প্রতিপাদিত করিলেন। বহিঃপ্রকৃতি যে তাঁহারই প্রকাশ বিভূতি, গীতা যেমন তাহা স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া দিয়াছে রৈবতকেও শ্রীকৃষ্ণ কাব্যারম্ভে অর্জ্জুনকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন—

এই শক্তি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান
প্রকৃতি এ-শক্তি, এই শক্তি ভগবান।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে এই ত্রিবিধ-বিভাব পরস্পর সংযুক্ত হইলে ও পৃথক পৃথক ভাবে আমাদিগকে তাহা বুঝিতে হইবে। কোন একটিমাত্র কাব্যের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে; শ্রীকৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা যেমন এক পূর্ণ অখণ্ড সত্তা, তেমনি তাঁহার মানবীয় ভাব, অবতার ভাব, তাঁহার নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, তত্ত্বভাব তিন কাব্যেই সমান ভাবে পরিস্ফুট। শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ তাঁহার মানবীয় ভাবের মধ্যেই নিহিত।

একদিকে অখণ্ড নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশে কাব্য-বিষয় অভিব্যঞ্জিত, অন্যদিকে মানুষরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিবর্ত্তন রৈবতকের প্রথম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসার অভিশাপের মধ্যে সে লীলা আভাসিত।

উষার প্রথমোন্মেষে ঋষিগণ প্রভাস তীরে ধ্যান-নিমগ্ন, অবশেষ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্তুতি আরম্ভ হইল।

গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি প্লাবিয়া গগন,
ভাসিল সমুদ্র মন্ত্রে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে,
ছুটিলতরঙ্গ পৃষ্ঠে দিক্ দিগন্তরে;
সেই ধ্বনি, সেই ধ্যান—সেই দৃশ্য মহান;

এমন সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন সমুদ্র মৃগুন, ঋষির মন্ত্ররব, শঙ্খধ্বনির গম্ভীর সমারোহে ঋষির আশীর্ব্বাদ অশ্রুত, কাজেই অনভিনন্দিত রহিল; স্বভাব-সুলভ অসংযতরোষ নিরঞ্জন দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিলেন—"যাদব কৌরব কুল হইবে বিনাশ"। পার্থ বাসুদেব উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন; অর্জ্জুন ভীত, আশাঙ্কিত; কৃষ্ণ স্থির, অবিকৃত স্বপ্রতিষ্ঠ তথাপি অর্জ্জুন যখন আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় দুর্ব্বাসার প্রীতিসম্পাদনায় অগ্রসর হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে মৃদু গঞ্জনায় তেমন হীন কাপুরুষোচিত প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের স্বৈরাচার লক্ষ্য করিয়া কঠোর ধিক্কার নিনাদিত করিলেন—

দেখ ধনঞ্জয়
ব্রাহ্মণের অত্যাচার। কথায় কথায়
অভিশাপ, অভিশাপ অঙ্গের ভূষণ।
শার্দ্দুল যেমন ভাবে প্রাণিমাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য; তেমনি ইহারা
ভাবে আর্য্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের।
বিনা দোষে, অকারণে করিবে দংশন
অভিশাপ বিষদন্তে; নাহি কিহে কেহ
ব্রাহ্মণ রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে
তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন?

এখানে প্রশ্ন আসে এই তীব্র ব্রাহ্মণ নিন্দার উৎস কোথায়? সঙ্কীর্ণ অনুদার মনোভাব বশে অনেকে অন্ধভাবে কবির ব্যক্তিগত অভিরুচি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কবির প্রতিই অবিচার করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে

অসংবৃত বিদ্বেষ বুদ্ধিতে উহাকেই একমাত্র কারণ রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন কোন কোন বিষয়ে স্বদেশে সামাজিক নির্য্যাতনে অসহিষ্ণু কবির রোষবহ্নি এমনই প্রদীপ্ত হইয়াছিল যে তাহারই প্রজ্বলন্ত শিখা যেন রুদ্র তেজে অভিব্যক্ত হইয়াছে উপরোক্ত ছত্রনিচয়ের মধ্য দিয়া, সুতরাং এই ব্রাহ্মণ নিন্দা কবির ব্যক্তিগত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সেই কারণেই কাব্যের বিষয় বস্তুর সহিত সঙ্গতিবিহীন।*

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব কাব্যের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ বিধৃত। অর্জ্জুনের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোচারণ সময়ে তাঁহার কৈশোরের বৈচিত্র্যময় অনুভূতি ও আত্মদর্শনের এক অনবদ্য চিত্র ফুটাইয়া তুলিলেন। রৈবতকের এই সপ্তম স্বর্গটিও একটি খণ্ডকাব্য। এই একটি মাত্র অধ্যায় নবীনচন্দ্রকে অমরত্ব দান করিতে পারিত। ভাষার ঝঙ্কারে, সুরের লালিত্যে, বর্ণনার সাবলীল গতিতে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সুমধুর মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাবলীর অপরূপ বাঙ্ময় প্রতিচ্ছবি—ছত্রে ছত্রে সেই বিরাট জীবনের পূর্ব্বাভাস অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে সূচিত হইয়াছে। একদা অকস্মাৎ নিবিড় জলদজালে গগন আচ্ছন্ন হইল; ঘোর সন্ধ্যাছায়া কাননশোভা মলিনীকৃত করিল; তট-ঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে, মেঘ-প্রস্রবণ অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে তরুতলে, গিরিকোটরে বনকদলীর পত্রচ্ছত্রতলে গোপালগণ বৃষ্টিধারা হইতে আত্মরক্ষায় তৎপর হইয়া পড়িল, অবশেষে মেঘমুক্ত রবিকরে আবার বনভূমি সুজলা শ্যামলা হইয়া হাসিয়া উঠিল; তখন তাহারা ক্ষুধায় আকুল;—

দেখিনু অদূরে বহু ঋষির আশ্রম;
বলিলাম—'ভিক্ষা তরে যাও সখাগণ';

ব্রাহ্মণ যজ্ঞের অন্ন না দিল রাখালে—
নীচ গোপ জাতি। শ্রান্ত বালক বালিকা
অপমানে ম্লানমুখে আসিল ফিরিয়া।

সেই দিনই তাঁহার "জীবনের ভাবনা প্রথম" উন্মেষিত হইল ;—

একই মানব সব, একই শরীর ;
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্মমৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ গোপ জাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?
চারি বর্ণ, চারি বেদ ; দেবতা তেত্রিশ ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর ;—

কামনামূলক এই জীবঘাতী যজ্ঞের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তিনি বৃন্দাবনে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন। এই ইন্দ্রযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সমর্থিত বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডেরই অন্তর্গত। ইহা কবির স্বকপোল কল্পিত নহে, ভাগবতে ইহার প্রকৃষ্ট সমর্থন রহিয়াছে। এই ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গকালে তিনি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই। তিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতেই নিগূঢ় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ; হৃদয়ের নির্ম্মল পটে কর্ত্তব্যের সেই দিব্য রেখা ভাসিয়া উঠিল, তিনি যেন কোন্ অজ্ঞাত শক্তিবলে চালিত হইয়া সেই রেখার আলোক অনুসরণ করিয়া চলিলেন ; অন্তরের গহন হইতে যেন কি এক বাণী নিঃসৃত হইল।

কেবা ইন্দ্র ? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত
সঞ্জীবনী সুধারাশি, স্বভাবে চালিত
ভ্রমে রবি, শশী, তারা, বহে সমীরণ ;
স্বভাব নিয়ন্তা এক বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর
স্বভাবের অনুবর্ত্তী বিশ্বচরাচর ;

এইভাবে চিন্তামগ্ন অবস্থায় তিনি যেন আপনাতে ডুবিয়া গেলেন; বাহ্যদৃশ্য যেন অন্তর্হিত হইল; হৃদয়ের গভীরে স্ফুরিত হইল এক পরম সত্য; তিনি দেখিলেন অনন্ত জ্যোতিঃসাগরে ভাসমান এই ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যামা; সেই কিরণ-সাগর হইতে নিঃসৃত হইতেছে, 'অনন্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্'; তিনি তখন অনুভব করিলেন,

সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ
অবিচ্ছিন্ন সর্ব্বত্রই আছে বিদ্যমান
করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ব বিধান;

সেই অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি বলে তিনি শুনিলেন,

এক জাতি মানব সকল;
এক বেদ মহাবিশ্ব অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়;
একমাত্র মহাযজ্ঞ,—স্বধর্ম্ম সাধন।

তারপর কৈশোর লীলাশেষে যখন শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে বসিয়াও তিনি সমগ্র ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন। ভারত-অদৃষ্টাকাশে চারিদিকে যে নীরদ সঞ্চার হইতেছিল—একদিকে সাজিতেছে—জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভগদত্ত; অন্যদিকে "হস্তিনা হিংসায় মত্ত ক্ষিপ্রগ্রহমত, আঘাতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ"; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যেন মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন ভীষণ সংঘর্ষণ, বিপ্লব ভীষণ,

ভাবিতে না পারি
এ রাষ্ট্রবিপ্লব, এই ঘোর নির্য্যাতন
জননীর, আত্মহত্যা, সাধুর দুর্দ্দশা
অসাধুর আধিপত্য, ধর্ম্মের বিলোপ;

তাঁহার মন তখন গভীর আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন ভারত এই অত্যাচারে কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে, আর যত রাজ্য গতিভ্রষ্ট গ্রহের মত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে অগ্রসর হইতেছে; এই অবস্থা শৈল-প্রতিমূর্ত্তির মত নিশ্চেষ্ট ভাবে, শুধু দ্রষ্টৃস্বরূপে নিরীক্ষণ করিবার মনোবৃত্তি তাঁহাকে যেন পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল; ব্যাসদেব তাঁহার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চিত্রের অন্যদিক প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন—যত গৃহবাসী-বিপ্রগণ বনবাসী ঋষি,

উদ্ধকর্ণে তব কার্য্য করিছে শ্রবণ;
ভাগিতেছে অভিসন্ধি, ভাবিছে বিপ্লব
সাম্রাজ্যে, সমাজে ধর্ম্মে উদ্দেশ্য তোমার,
তুমি এ বিপ্লবকারী;

তদুত্তরে কেশব যাঁহা বলিয়াছিলেন তাহা যেন বর্ত্তমানে পর-শাসিত ও পর-শোষিত ভারতের মুক্তি সাধনার মহান্ ঋক্,

আমি এ বিপ্লবকারী! মহর্ষি! মহর্ষি!
নাহি দিবে যারা প্রভো ভবিষ্যৎ ব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূরে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল আদি জাতি ভারতের,
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?

এইখানেই বিশদীকৃত হইল যে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্রোহ ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে নহে। তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ শাসিত সেই নীতির বিরুদ্ধে যেই নীতি যুগে যুগে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক না হইয়া উগ্র পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়; সেই নীতি বলে মানুষ

কেবল জন্মগত অধিকার লইয়া অপর মানুষের উপর অন্যায় প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে, যাহার ফলে সমাজের একটি বিশেষ অংশ পঙ্গু হইয়া পড়ে ; যেই নীতি আধুনিক ইউরোপে নাৎসী-প্রচারিত Herrenvolk বা জাতি প্রাধান্যের অনুরূপ, সেই নীতি মানুষকে শুধু বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের কূটচক্রে নিষ্পেষিত করিতেছে, যাহাতে

"আর্যধর্মনীতি
প্রীতিময়, প্রেমময় শান্তি সুধাময়
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।

নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে দ্রোহ বুদ্ধি প্রদর্শন-কালে গীতাপ্রদর্শিত পথেই চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ কোন মতবাদের উপর তাঁহার 'স্বধর্ম' প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ধর্ম অর্থে মানুষ বুঝিয়া থাকে কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান। ধর্ম যখন মানুষের মধ্যে নিহিত দুষ্প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে না, অন্তর-জীবন-গঠনে সহায়ক না হইয়া ধর্ম যখন প্রাণহীন আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখনই হয় ধর্মের গ্লানি। প্রত্যেক মানব অনন্ত অখণ্ড চৈতন্যের অংশ স্বরূপ ; প্রত্যেক মানুষই আপন অধ্যাত্ম সত্তায় ভগবানের সহিত এক,—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ;—এই সেই গহ্বরেষ্ঠং গরিষ্ঠং গোপন আত্মাকে জীবনের কর্মে প্রকটিত করাই মানব-জীবনের সার্থকতা ; এই উত্তমং রহস্যম্ যখন শুধু শুষ্ক বহিরঙ্গবদ্ধ ক্রিয়াকলাপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখনই হয় ধর্মের গ্লানি। মানুষের মধ্যে যে উচ্চতর ভাগবত চৈতন্য লুক্কায়িত, সেই চৈতন্যের মধ্যে আমাদিগকে যে আবার নব নব জন্ম লাভ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা মানুষ ভগবানের "সাধর্ম্য" লাভ করিবে—মদ্ভাবমাগতাঃ—এই সত্যকে জীবনে রূপায়িত করাই সকল সাধনা, সকল অনুষ্ঠান ও যজ্ঞের

মূল.তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বিস্মৃতি বা বিকৃতিই ধর্ম্মের গ্লানি। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন বাহ্যিক বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষ যেন বন্দী হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতেই মানুষ তাহার উন্নততর বাণী—অমৃতস্য পুত্রাঃ—বিস্মৃত হইয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—এই ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি উপলব্ধি করিয়া তিনি বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন—পক্ষান্তরে প্রকৃতির মধ্যে যে মহান যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে, সেই যজ্ঞের অনুবর্ত্তনে মানুষকে ও জীবনের সকল কর্ম্ম চিন্তা ও সঙ্কল্পকে শুধু যজ্ঞরূপে নিরাসক্ত চিত্তে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে, এই আত্মধর্ম্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন—তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'—ইহাই প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ সেই ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, তাহারই প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ। প্রকৃত বেদ-ধর্ম্মের বিচারে প্রবেশ করিয়াই তিনি ব্রাহ্মণের হিংসা-সর্পকে নির্বিষ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

গীতায় যে কর্ম্মবিভাগের উল্লেখ আছে,—সেই কর্ম্ম কি? কোথাও ইহাকে 'সহজ' কর্ম্ম, কোথাও 'স্বভাবজং' কর্ম্ম কোথাও 'স্বভাবনিয়ত' কর্ম্ম বলা হইয়াছে। শুধু কর্ম্মগতভাবে যে লোকের কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হয়—সেই কর্ম্মের ভিত্তিতে এই সকল বাক্যের ব্যাখ্যা করিলে গীতার প্রকৃত অর্থকে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ করা হয়। কেন না প্রত্যেক জীবনে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আত্মবিকাশের অনুকূল অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী কোন একটি দিকই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে; প্রত্যেকের স্বভাব সেইটিকেই বিকশিত করিতে গিয়া অন্যান্য শক্তিকেও বিকশিত করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এবং তাহার মধ্য দিয়াই পূর্ণ অধ্যাত্ম সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া যায়। চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যায় একক ব্রহ্মার মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল বর্ণই বিধৃত ছিল। অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই চারিবর্ণের মধ্যেই শক্তি, জ্ঞান ও সত্য-বোধের তারতম্যানুসারে এক ব্রহ্মারই আত্মপ্রকাশ। সুতরাং শাস্ত্রার্থের যথার্থ মর্ম পরিগ্রহ করিতে হইলে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে কোন বর্ণই ব্রহ্মগুণ-বর্জ্জিত নহে। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই নিবিড়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ। উচ্চতম ব্রাহ্মণই হউক, অথবা নিম্নতম শূদ্রই হউক প্রত্যেককেই ভগবানের স্বাধর্ম্ম্য লাভ করিতে হইবে ইহাই গীতার শিক্ষা। মানুষের জীবনের কুরুক্ষেত্রে প্রত্যেককেই ভগবানের স্বাধর্ম্ম্য লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই অক্ষয় পুরুষের শান্ত নিষ্ক্রিয় শোকশূন্য নির্ব্বিকার আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা যেমন ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়, শম-দমাদি গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন দ্বারা লাভ করিতে পারে, শূদ্রের পক্ষেও তাহা নিষ্কাম, অনাসক্ত নিয়ত কর্ম্মের দ্বারা লভ্য। সেই কর্ম্ম সেবাই হউক যাহা শূদ্রের ধর্ম্ম, আর সমত্বরূপ যোগই হউক যাহা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট, সকলই যোগ। সেই পূর্ণ সমত্ব যোগের মধ্যেই ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল বর্ণেরই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ না হইলে যোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনার অলৌকিক জীবনেই চারি বর্ণের ধর্ম্মকে প্রকটিত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন পুরুষোত্তম—যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ—অন্যদিকে তিনিই ক্ষত্রিয় বীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথে সারথী, যুদ্ধের চালক ও নিয়ামক, একদিকে তিনি বৃন্দাবন লীলায় গোচারণে বৈশ্যধর্ম্মের মূর্ত্তরূপ অপর দিকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে

ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইয়া শূদ্রের নিষ্কাম সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। মানব-চরিত্রের সকল বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করতঃ তিনি আপনার যে মহান রূপ প্রকট করিলেন ইহাই আদর্শ মানবচরিত্র। এইভাবে তিনি অনার্যের মধ্যেও দেখিয়াছিলেন মানবত্বের লুক্কায়িত বিভব। ব্যাসদেব বলিতেছেন:—

সেইরূপে আর্য্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য দুর্ব্বলে
সেইবলে প্রতিঘাত খাইবে নিশ্চয়
একদিন……
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য, রাজত্ব দয়ার
বিশ্বরাজ্য ন্যায়রাজ্য, রাজত্ব নীতির
ক্ষুদ্র বনপুষ্প হ'তে অনন্ত গগন
সর্ব্বত্র অনন্ত জ্ঞান অনন্ত কৌশল
সর্ব্বত্র অনন্ত প্রীতি। হেন মহারাজ্য
যতদিন যদুশ্রেষ্ঠ না হবে স্থাপন
ততদিন আর্য্যরাজ্য জানিও নিশ্চয়
ভীষণ কালের স্রোতে বালির বন্ধন।

সুতরাং অনার্যকে আর্যের সহিত পরিপূর্ণ মিলনের উদ্দেশ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন তাহার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা, অনার্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহের সর্ব্বতোমুখী প্রকাশের সহায় হওয়া। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যের যেই সঙ্কীর্ণ নীতি সাধারণতঃ 'নান্যদস্তীতিবাদিনঃ' বেদবাদরত ব্রাহ্মণের অন্যায় উদ্ধত অত্যাচারে সমাজে দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহাকে বিদূরিত করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, স্ত্রী শূদ্রে প্রকৃত বেদধর্ম যদি

মহান্ সর্ব্বমানবীয় আদর্শের প্রেরণায় প্রচারিত ও অনুশীলিত না হয় তাহা হইলে ব্যাসের মানসনেত্রে প্রতিফলিত সেই মহারাজ্য স্বপ্নে পরিণত হইবে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কীর্ত্তিত চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বানুযায়ী সকল বর্ণান্তর্গত মানবের পরিপূর্ণ বিকাশ বাঁধামুক্ত করিয়া চাহিয়াছিলেন এক মহারাজ্য স্থাপন করিতে:—

একধর্ম্ম এক জাতি এক সিংহাসন।

নবীনচন্দ্র যুগোপযোগী এই নব ধর্ম্মের আদর্শ প্রচার কল্পে শ্রীকৃষ্ণকে নবভাবে রূপায়িত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই; ব্রাহ্মণ-পরিসেবিত সনাতন ধর্ম্মকে বিকৃত করিতে প্রয়াসী হন নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে নবশক্তিতে উদ্বোধিত করিয়া ভারতে মহাভারত-স্থাপন।

দুর্ব্বাসার অভিশাপ কবির কল্পিত; মহাভারতে তাহা নাই। এই অভিশাপ একটি মহত্তর বিষয় অবতারণার উপায় মাত্র। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মহাকবি কালিদাসও এই উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবশ্য সেখানে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। এখানে অনার্য্যের উন্নয়ন। বৃহত্তর জাতীয় জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে বদ্ধ করিবার পূত মহান্ সঙ্কল্পে অনার্য্যের প্রতি সহানুভূতিই যথেষ্ট নহে; পক্ষান্তরে ব্যাপকভাবে তাহাদের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুব্যবস্থা—ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়-সিদ্ধির পক্ষে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্কীর্ণতা পরিহার যে কত অপরিহার্য্য শ্রীকৃষ্ণ তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ভারতীয় বিরাট মানব-মণ্ডলীর একটি বিশেষ অংশকে অশিক্ষিত, জ্ঞানে ও কর্ম্মে পঙ্গু করিয়া রাখিলেও জাতীয় জীবনই হইবে দুর্ব্বল;

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছিলেন—

একপক্ষ শীর্ণ যে পাখীর
ঝড়ের সঙ্কটদিনে না রহিবে স্থির ;

অবশেষে যে কোন বৈদেশিক আক্রমণের স্রোতোমুখে সমগ্র জাতি তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে—

রাজ্যভেদ গৃহভেদ, জাতিভেদ প্রভু,
ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটাইছে হায়,
বলবান কোন জাতি পশ্চিম হইতে
আসিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্যজাতি তৃণরাশি মত

সুতরাং আর্যে ও অনার্যে সমভাবে এমন এক বিরাট মানবত্বের ভিত্তি সংস্থাপন করিতে হইবে যাহা রহিবে অক্ষয় অচল শৈল মৈনাকের মত। অনার্যের উন্নতির পথে ব্রাহ্মণের সৃষ্ট যে প্রবল বিঘ্ন, তাহাও দুর্ব্বাসার প্রতি প্রযুক্ত বাসুকির বাক্যে ধ্বনিত।

যেই নীতি চক্রে
হতেছে অনার্য জাতি এত নিষ্পেষিত
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার ;
শীর্ষস্থানে ঋষিগণ ;

অনার্যের কি অধঃপতন, কি হীনতা, মনুষ্যত্বের কি অবমাননা বাসুকিকণ্ঠে তাহাও-মন্দ্রিত ; কাব্যে চিত্রিত এই অনার্য পীড়ন ও অনার্য শোষণ আধুনিক কোটি কোটি নরনারীর নিখুঁত চিত্র নহে কি ?

আছিল যে জাতি এই ভারত ঈশ্বর
আজি তারা হা বিধাতঃ বিদরে হৃদয়
অস্পৃশ্য উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর অধম ;
তাহাদের শূদ্র নাম ; দাসত্ব ব্যবসা

অর্দ্ধাহার, অনাহার, জীবন নিয়ম ;
পরমার্থ আর্যদের চরণ লেহন,
পদচিহ্ন পুরস্কার ; দেখিবে যখন
পবিত্র আর্যের মূর্ত্তি, যাইবে সরিয়া
শতহস্ত ; প্রণমিবে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া।
কেবল সঞ্চিবে অর্থ। ধরিবে জীবন
আর্যের সেবার তরে ! তিরস্কার ভাষা
পদাঘাত সদাচার, করে হত্যা যদি
আর্য কেহ, নরহত্যা নহে কদাচন।

এখন অনার্যের অভ্যুত্থানের অনিবার্য প্রয়োজনে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বিকাশই যে প্রত্যেক মানবের জন্মগত অধিকার, এই নীতিই কবি উপস্থাপিত করিলেন—যাহাতে বর্ত্তমান রুশ দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর মত প্রত্যেক অনার্য নর নারী অখণ্ড অবিকৃত মানবত্বে গৌরবান্বিত হইয়া একই মহাভারত সংস্থাপনে উৎসর্গিত জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে।

এই নব হিউম্যানিজম্ এর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি রৈবতকের প্রারম্ভে ঋষিগণের সূর্য্যস্তুতির নিন্দাচ্ছলে মানবত্বের মহামন্ত্র উদ্‌গীত করিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এইখানে নবীনচন্দ্র আধুনিকতার সুর মন্দ্রিত করিয়াছেন। সূর্যকে তিনি বিশ্বনীতির অন্তর্ভুক্ত জড়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহকেই সমর্থন করিয়াছেন। একদিকে এই বর্ণনা সত্য হইলেও একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে কাব্যে সন্নিবেশিত সূর্য্যস্তুতিদ্বয়ের মধ্য দিয়া ঋষিগণ অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন জড়সূর্য্যকে নহে ; পক্ষান্তরে তাঁহারা আরাধনা করিতেছেন সেই পরমজ্যোতিকে—জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে—, তিনি

'জ্ঞানাতীত', 'কালাতীত', অচিন্ত্য, বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ, জগৎ-পালন, জগদ্-ধারণ ও জগদ্-ধ্বংসন, তিনি ত জড়সূর্য্য নহেন; পক্ষান্তরে এই স্তুতিদ্বয় পুরাণে প্রখ্যাত সেই স্তুতিরই প্রতিধ্বনি—

কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
যস্মাদগ্নীন্দ্ররূপস্ত্বমতঃ পাহি দিবাকর ॥

"হে দিবাকর! তুমি কালাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বেদাত্মা ও বিশ্বতোমুখ; তুমিই অগ্নীন্দ্ররূপী, অতএব আমাকে পরিত্রাণ কর।" আমরা মনে করি ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গের মধ্যে কবি অধিকতর আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তবুও কবি এই সূর্য নিন্দার আশ্রয়ে বেদোক্ত যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডকেই নিন্দা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবের অচিন্তনীয় অসীম শক্তির জয়গান ধ্বনিত করিতেছেন:—

মানব উৎকৃষ্ট, স্পষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃজিত পালিত এই বিশ্ব চরাচর
পড়েছে সে জ্ঞান ছায়া হৃদয়ে যাহার
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শকতি
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর।

শ্রীকৃষ্ণ তেমন মানবত্বের আধাররূপী, পূর্ণ, আত্মস্থ, ব্রাহ্মী স্থিতিতে স্থিতপ্রজ্ঞ; রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিতে অপূর্ব্ব কৌশলী; তিনিই পূর্ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতীক, কর্ম্মেও অকর্ম্মী, শত্রুক্ষেত্রে সমবুদ্ধি 'লোক-সংগ্রহের শরীরী বিগ্রহ; বঙ্কিমবাবুও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ গৃহী, সংসারী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী ও ধর্ম্মপ্রচারক—সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ।"

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের প্রতি "মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে", "পড়ি' মণ্ডূকের মত" প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য ব্যবহার করিলে দুর্ব্বাসাকে বাসুকি বলিতেছেন:—

যজ্ঞ-ব্যবসায়ী

কাপুরুষ তুমি ঋষি, বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ !

এই বাক্যেও দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্রিত হইয়াছিল শুধু যাগযজ্ঞের মধ্যে—

কর্ম্ম, যাগযজ্ঞ ! জ্ঞান, সংসার বর্জ্জন ।

যে ব্রাহ্মণ্য কেবল কাম্যকর্ম্মের উপরেই মানবের সমস্ত ধর্ম্মসাধনা স্থাপিত করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন—

অন্তরবিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত ভারত
কবাল কামনাদগ্ধ, কাম্যকর্ম্মে হায় ।

"বৈদিক ধর্ম্মের এই ঘোর পরিণাম" দেখিয়া তিনিও অন্তর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলেন; দুর্ব্বাসা তাঁহাকে "বেদদ্বেষী" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ বেদকে নিন্দা করেন নাই; পক্ষান্তরে তিনিই বলিয়াছিলেন :—

করিলা মহর্ষি
সঙ্কলন চারিবেদ—চারি কীর্ত্তিস্তম্ভ
সর্ব্বধ্বংসী কালগর্ভে; চারি হিমাচল
চিন্তার জগতে; চারি অনন্ত ভাস্কর
মানবের জ্ঞানাকাশে;

গীতায়ও ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয় গীতাধর্ম্মেরই নব রূপায়ণ। বেদবাদ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

বেদবাদিগণের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার লক্ষ্য হইতেছে ইহকাল ও পরকালে ভোগৈশ্বর্য লাভ; কিন্তু যাহারা বলে যাগযজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর মহত্তর ধর্ম্মকর্ম নাই—নান্যদস্তীতিবাদিনঃ—জীবনের অন্য কোন পরমার্থসাধক লক্ষ্যও নাই—এই সকল শ্রুতিমনোহর—পুষ্পিতাং বাচং—বাক্যে যাহারা মানুষকে ভোগৈশ্বর্যের আরাধনার মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চায় শ্রীকৃষ্ণ এইসকল বেদবাদরত ব্রাহ্মণগণকেই নিন্দা করিয়াছেন—দুর্ব্বাসা এই প্রকার বেদবাদের মূর্তিমান রূপ। দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণকে বেদব্রাহ্মণের শত্রু বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বেদের নিন্দা করেন নাই; বেদের যাহা প্রকৃত অর্থ তাহাই স্বীয় জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বাণীতে সার্থক করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার নিন্দাব্যপদেশে তিনি যে ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়াছেন সেই নিন্দা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণবিদ্বেষপ্রসূত নহে, সে নিন্দা বেদের বিরুদ্ধেও নহে; পক্ষান্তরে যাহারা বৈদিক-ধর্ম্মকে বিকৃত বিপর্যস্ত করতঃ সমাজে, রাষ্ট্রে ও জীবনে 'মহতী বিনষ্টি' সংসাধিত করিয়াছিলেন—সে নিন্দা তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে। এই জ্ঞানেই তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করেন, গোবর্দ্ধন পূজা প্রচলিত করেন, বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বেশ্বর পূজা সমর্থন করেন; বিশ্বের সকল পদার্থেই বিষ্ণু বা ভগবান্ অনুস্যূত—বিশ্ (ধাতু) প্রবেশনাৎ—এই পাবনী বুদ্ধিই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি; বিশ্বকাব্যের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের পূজায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল সূত্রটি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

পূজি বিশ্ব, পূজ বিশ্বরূপ নারায়ণ,
স্বভাব-মন্দিরে, উচ্চ স্বভাবের বেদী

পুণ্য গোবর্দ্ধন শিরে, হলো প্রতিষ্ঠিত
গোপদের নিরমল হৃদয় গগনে
বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ নক্ষত্রের মত।

যে ব্রাহ্মণ বৈদিক ধর্ম্মের বাহক ও রক্ষকরূপে প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্মের গভীর অধঃপতন সংসাধিত করিয়াছেন—সেই ব্রাহ্মণকেই তিনি নিন্দা করিয়াছেন :

বেদভারে প্রপীড়িত, যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন
উষ্ণজীবশোণিতে প্লাবিত ;
এইভাবে কামনানলে প্রদীপ্ত ভারতে,
কেমনে পতঙ্গ ক্ষুদ্র বেদরূপী হিমাচল
করিবেক করে উত্তোলন ?

এইভাবে বেদের প্রকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতে স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে—সেই ধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ নহে—পক্ষান্তরে বেদ প্রতিপাদিত প্রকৃত মানব ধর্ম্মেরই পুনরুত্থান ; সুলোচনার মুখে এই 'বেদধর্ম্মের' উদ্দেশ্য দৃঢ়তম ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—

এ মহাধর্ম্মের
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্ব্বভূতহিত।

গীতা এই ধর্ম্মকে বলিয়াছে 'লোক সংগ্রহ'; শ্রীকৃষ্ণজীবন এই ধর্ম্মেরই প্রকটন ; নবীনের কাব্যত্রয় এই ধর্ম্মেরই আনন্দ সুর।

তথাকথিত ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের অন্তরালে আরও একটি সত্য নিহিত রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের পর হইতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদমূলক মায়াবাদ সমগ্র ভারতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে সন্ন্যাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আচার্য শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যে এই সন্ন্যাসকেই গীতা-ধর্ম্মের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ও নীতি বলিয়া তাঁহার অপরিসীম লোকোত্তর প্রতিভা ও ধীশক্তি বলে

প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সেই সন্ন্যাসবাদের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে যে ভাঙন আরম্ভ হয় তাহাতে কর্ম্ম-বিমুখতা এবং সংসার ত্যাগ জীবনের মূল উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। বৈদেশিক আক্রমণে ও বৈদেশিক শাসনে উহা অবশেষে ভারতবাসীকে হীন-বীর্য, তমোভাবাপন্ন করতঃ দাসত্বের নিম্নতম স্তরে নামাইয়া আনে। আধুনিক যুগে লোকমান্য তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর-প্রচারিত সন্ন্যাস-বাদের বিরুদ্ধে নব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহারা সন্ন্যাসের অপ্রয়োজনীয়তা এবং অবাঞ্ছনীয়তা প্রতি-পাদন করতঃ আসক্তিহীন, নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে উৎসর্গময় জীবনের মহনীয়তা কীর্ত্তিত করেন। ইঁহাদের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নবীনচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে জাতীয় জীবনের এক পরম সন্ধিক্ষণে সন্ন্যাসবাদমূলক গীতা-ধর্ম্মকে ভিন্নপথে প্রবাহিত করাইলেন। কর্ম্মযোগেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার সঙ্কল্পে তিনি একদিকে সন্ন্যাসবাদ, অপরদিকে ক্রিয়াবিশেষবহুল যাগযজ্ঞকে পশ্চাতে ফেলিয়া কর্ম্মের পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করতঃ বহু শতাব্দীর মোহাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আত্মশক্তির অমৃত-অভিষেকে উদ্বোধিত করিতে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ

একালের চোখে সেকালের নবীন

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সেকালের নবীন সেন (১৮৪৬-১৯০৯) একালের সত্যেন দত্তের মতন "সাম্য-সাম" লিখিয়া যান নাই। নজরুলি "সর্ব্বহারা"ও নবীনের হাতে বাহির হয় নাই। অধিকন্তু শান্তি ব্যানার্জি, নির্ম্মল দাস ইত্যাদি সাম্প্রতিক বা অতি-আধুনিক কবিদের মজুর কিষাণ আর কাস্তে কোদাল নবীন কাব্যের মুদ্দা নয়। এই কথাগুলা মনে রাখা ভাল। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, জীবনের অন্যান্য সব-কিছু সম্বন্ধেই নবীন-সাহিত্য ১৯৪৬ সনে ও অতি-নবীন বাঙালির বাচ্চার খোরপোষ জোগাইতে সমর্থ। অর্থাৎ নবীনের বয়েৎগুলা বিংশ-শতাব্দীর মাঝামাঝিও বাঙলার যে-কোনো ছেলে-মেয়ের পক্ষে তাজা সরল ও সাঁজাল মাল; নবীনকে আজও "সেকেলে" বলা চলিবে না।

নবীন-সাহিত্যের দৌলতে কমিউনিষ্টদের সহি মাফিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" "প্রভাস" বগল-দাবা করিয়া বাহির হইলে একালের যে-কোনো আখড়ায় ঘাড় খাড়া রাখা সম্ভব। গণতন্ত্র জাহির করা সম্ভব। নারীত্ব বা মেয়েদের পুরুষ-সাম্য সম্বন্ধে মোল্লাগিরি করা সম্ভব। বিজ্ঞানের দিগ্‌বিজয় চালানো সম্ভব। মানব জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে টনটনে আশা ভরসা রাখা সম্ভব। "ভাঙিতেছে পুরাতন, গড়িছে নূতন,—জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন" নবীন সাহিত্যে এই সূত্রে মজুদ আছে উন্নতি নিষ্ঠার মন্ত্র। অধিকন্তু নবীনকে ভারতীয় ঐক্যের ঋষিরূপে পূজা করা সম্ভব। হিন্দুদের জাত-পাঁত ভাঙিবার মুগুররূপেও নবীন-সাহিত্যের সদ্ব্যবহার করা

সম্ভব। আর সম্ভব বিশ্ব-বোধ, বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-ধর্ম্ম ইত্যাদি বুলি আওড়ানো।

নবীনের এই বই তিনটা বাহির হইয়াছিল ১৮৮৬-৯৬ দশকের যুগে। সেই আবহাওয়ায় চলিতেছিল একদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শৈশব; আরেক দিকে মার্কিণ মুল্লুকে বিবেকানন্দের হাতে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সে হইতেছে দুনিয়ায় বিংশশতাব্দীর বৃহত্তর ভারত। তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ (১৮৮২) খাইয়া নবীন মানুষ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারও অনেক আগে নিজেই "পলাশীর যুদ্ধ" (১৮৭৫) লিখিয়া নবীন নয়া বাঙ্‌লার অন্যতম বাপ্‌কা বেটা রূপে দুনিয়ায় নিজের জন্য স্থায়ী ঠিকানা কায়েম করেন। সেকালে তাঁহার অন্যতম জুড়িদার হেমচন্দ্র "ভারত বিলাপ" "ভারত সঙ্গীত" আর "ভারত-ভিক্ষা" (১৮৭০-৭১) একালের (১৯০৫-১০ সনের) বঙ্গ-বিপ্লব আর রাবীন্দ্রিক স্বদেশী সঙ্গীতের গোড়াপত্তন করিতেছিল।

নবীন ও হেম বায়রণের ঝাঁজ আর টেনিসনের প্রগতি বাঙালীর পাতে-পাতে পরিবেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের গীতি-কাব্য, মহা-কাব্য আর নাট্য-কাব্যে এই পাশ্চাত্ত্য দস্তুর জল্-জল্ করিতেছে। কিন্তু নবীন-সাহিত্য আর হেম-সাহিত্য মামুলি প্রচার সাহিত্য নয়, এই সবের মারফৎ তাঁহারা দেখাইয়াছেন চরিত্র বা ব্যক্তি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, ঘটনা খাড়া করিবার কায়দা আর অবস্থা গড়িয়া তুলিবার কর্ম্ম কৌশল। এক কথায় হেম ও নবীন স্রষ্টা শিল্পী অর্থাৎ অতি উঁচু দরের কবি।

একালের সত্যেন, নজরুল, শান্তি, নির্ম্মল, ইত্যাদি কবিরা নয়া নয়। পাশ্চাত্ত্য মাল বাঙালীর বাচ্চাকে খাওয়াইতেছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু হেম-নবীনের মতন এই আধুনিকেরা ব্যক্তি-স্রষ্টা

ঘটনা-স্রষ্টা আর অবস্থা-স্রষ্টা কিনা অথবা কতখানি স্রষ্টা ও শিল্পী,—অর্থাৎ উঁচুদরের কবি কিনা অথবা কতখানি উঁচুদরের কবি,—তাহা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

সাহিত্য সমজদারেরা কর্ম্ম পাহাড়ে একাল-সেকালের সাহিত্যগুলা ঘষাঘষি সুরু করুন। তাহা হইলে নবীন সেনের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাহিত্য সমালোচনার আসরে একটা নয়া আলো দেখা দিবে। সেই আলোর কিম্মত লাখ টাকা।

সকল কবিই সমাজ-সচেতন আর প্রচারক বটে। কিন্তু সকল কবিই স্রষ্টা, শিল্পী বা রূপদক্ষ নন। যে সকল প্রচারক বা সমাজ-সচেতন কবি স্রষ্টাও বটে তাঁহারাই উঁচুদরের কবি। নবীন সেন দুনিয়ার সেই সকল উঁচুদরের কবিদের পয়লা শ্রেণীর অন্যতম।

বিনয় সরকার

কবিবর নবীনচন্দ্রের আদর্শবাদ

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

এম.এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন অসামান্য কবিপ্রতিভা নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু কবি ছিলেন না, তিনি দ্রষ্টাও ছিলেন। আমরা একই সময়ে এইরূপ দুইজন প্রতিভাশালী মনীষীকে পাইয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহাদের একজন বঙ্কিমচন্দ্র, অপরজন নবীনচন্দ্র। গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও পদ্য সাহিত্যে নবীনচন্দ্র তাঁহাদের অপূর্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই দুইজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি বেশীর ভাগ সমসাময়িক ভারতের দিকে নিবদ্ধ ছিল, আর নবীনচন্দ্রের দৃষ্টি গৌরবময় প্রাচীন ভারতের দিকে আকৃষ্ট

হইয়াছিল। তবে মনোভাবের দিক দিয়া উভয়েই কবিভাবাপন্ন এবং দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে দেখিয়াছেন প্রথমে ব্যক্তিত্ব, তাহার পর পরিবার ও সর্বশেষ সমাজ ও মানবতার বিকাশের মধ্য দিয়া। আর নবীনচন্দ্র মানুষের উন্নতি ও মনুষ্যত্বের বিকাশকে কোন সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া বৃহত্তর মানব সমাজের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বপ্রেম ও সার্বজনীনতা উভয়েই স্বীকার করিলেও নবীনচন্দ্র ইহাদের পরিস্ফুরণের দিকে অধিক জোর দিয়াছিলেন। আদর্শ মানবের পরিকল্পনার দিক দিয়া উভয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ইহার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়ের নিকটই শ্রীকৃষ্ণ মহামানব অথবা মহাপুরুষ এবং এই পরিকল্পনা নবীনচন্দ্রের মনেই প্রথমে উদিত হয়।

কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়া নবীনচন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেমন বুঝিয়াছিলেন তেমন কয়জন বুঝিয়াছিলেন জানি না। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নবীনচন্দ্র যে অপূর্ব বিশ্বপ্রেম এবং প্রসঙ্গত স্বাদেশিকতা ও স্বদেশের ইতিহাসের প্রাচীন চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে স্বাদেশিকতা প্রবল এবং বিশ্বপ্রেম ও তৎসংক্রান্ত উদার মনোভাব সীমাবদ্ধ। কিন্তু নবীনচন্দ্রের আদর্শ এই দিক দিয়া ঠিক বিপরীত। তাঁহার স্বাদেশিকতা তত তীব্র নহে, বরং বিশ্বপ্রেমের উদার ভূমিতে তাহা নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নবীনচন্দ্রের ইতিহাস-জ্ঞানের যে পরিচয় আমরা তাঁহার "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" এবং "প্রভাস" কাব্যত্রয়ে পাই তাহা স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ ও বিচার সহ হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমরা অনায়াসে তাঁহার এই ত্রুটি উপেক্ষা করিতে পারি. কারণ তিনি কবি, ঐতিহাসিক নহেন। এই বিষয়ে পরে আরও বলিতেছি।

নবীনচন্দ্র তাঁহার "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্যত্রয়ে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন ভারতের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপ ; ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে বিরোধ ছিল। এইরূপ আর্য্যদের সমাজে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও সদ্ভাব ছিল না। অনার্য্য বলিতে নবীনচন্দ্র আর্য্যদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন এবং কৃষ্ণকায় কোন এক জাতি কল্পনা করিয়াছেন—তাহারা নাগ জাতি ; সুতরাং নাগগণ সর্প নহে, মানুষ এবং তাহাদের রাজা বাসুকি। নাগ বাসুকির প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আর্য্যদের দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও কৌরব-পাণ্ডবগণ উল্লেখযোগ্য। এদিকে বাসুকির সাহায্যকারী এক আর্য্য ঋষির নাম দুর্ব্বাসা বা জরৎকারু। তিনি অতি কোপন স্বভাবের ঋষি ছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ যে ক্ষমা-গুণ তাহা তাঁহার মধ্যে ছিল না। যাগযজ্ঞকারী আর্য্যদিগের প্রতাপ নষ্ট করিবার জন্য বাসুকি ঋষি দুর্ব্বাসার সহিত নিজ ভগ্নী জরৎকারু বা মনসাদেবীর বিবাহ দিলেন। অপরদিকে ব্যাসঋষি পাণ্ডবদের বিশেষ সহায় এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগ্রাহী। পাণ্ডবপক্ষের অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং বন্ধুত্ব দৃঢ় করিবার প্রয়াসে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভগ্নী সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে কৌরবপক্ষে দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও কৌরবপক্ষে কোন সুফল ফলিল না। জরৎকারু (দুর্ব্বাসা) ও বাসুকি (কোন সময়ে সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী) কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এই যুদ্ধের ফলে শ্রীকৃষ্ণের কুল যদুবংশ যাহাতে ধ্বংস হয় সেই দিকেও উভয়ের লক্ষ্য ও অভিসন্ধি ছিল। দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ হইয়াও কেন অনার্য্য পক্ষ নিলেন তাহার কারণ, কৃষ্ণার্জ্জুন ভাবাবেশে অন্যমনস্কতাবশতঃ এই ঋষির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। উগ্রপ্রকৃতির ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে তিনি স্বদল ছাড়িয়া অনার্য্যদলে যোগদান করিলেন

এবং অনার্য্যরাজ বাসুকির বিশেষ সহায়ক হইলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে অনার্য্যদলে টানিবার চেষ্টার বর্ণনাও বেশ কৌতূহলজনক। তখনকার দিনে আর্য্য অনার্য্যে বিবাদ, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে (যথা দুর্ব্বাসা ও ব্যাস) বিবাদ, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে বিবাদ (যথা পাণ্ডব ও কৌরবদলের বিবাদ) এবং জরাসন্ধের দল ও শ্রীকৃষ্ণের দলের বিবাদ এবং ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে বিবাদ। সেই বিশেষ যুগে ভারতের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন এবং সর্ব্বত্র কলহ পরিস্ফুট; ভারতের সেই দুঃসময়ে শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বের উপরই ভারতের মুক্তি নির্ভর করিতেছিল।

একসময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে কলহের আভাস রবীন্দ্রনাথও দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখে দুর্ব্বাসা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করাইয়াছেন তাহাতে ইহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা:—

দেখ ধনঞ্জয়!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার। কথায় কথায়
অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
শার্দ্দূল যেমন ভাবে প্রাণিমাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য; তেমনি ইহারা
ভাবে অন্য ভিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের।

(রৈবতক, প্রথম সর্গ)

কবি ধর্ম্মগত, বর্ণগত ও সমাজগত দলাদলির ঊর্দ্ধে দেশপ্রীতিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্দেশ্যে বীর মোহনলালের স্বাভাবিক উক্তির মধ্য দিয়া কবি দেশভক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। এই উক্তির গভীরতা মর্ম্মস্পর্শী। যথা,—

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত

করে অনিবার, প্রীত
বরং হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর !"
"একদিন—একদিন—জন্মজন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহিলেন নর-গৃধিনীর করে !"
(পলাশীর যুদ্ধ, চতুর্থ সর্গ)

পুনরায়,— "প্রবেশিল যে বীরত্ব-স্রোত দুনিবার,
আর্য্য জাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ভেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কোহিনুর মুকুট আদরে
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ! ভারত তোমার
কতশত কোহিনুরে পূজেছে চরণ
আর্য্যমন-রত্নাকর দিয়ে উপহার।
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
তখন নাই রোমানের গর্ভস্থ স্বপন।"
(পলাশীর যুদ্ধ, চতুর্থ সর্গ)

আবার জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কবি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্ব-মানবতার যে উদার আদর্শ মনে পোষণ করিতেন তাহাও বড়ই অপূর্ব্ব। যথা,—

"মানুষ কি লয়ে বল মানুষ, ভগিনি ?—
আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়
এ-তিনের মনুষ্যত্ব। সেই নীতি যে
শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্মিক,

—মানবের মানবত্ব, করিছে ধারণ,
তাহাই মানব ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম-পালনে,
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়,
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব, সুখ নিরমল।"

(কুরুক্ষেত্র, ত্রয়োদশ সর্গ, সুভদ্রার উক্তি)

পুনরায়,— " ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর
এ ধর্ম্মের গৃহ, দিদি! এ মহাধর্ম্মের
ভিত্তি লোকহিত; ভিত্তি সর্ব্বভূতহিত।"

(কুরুক্ষেত্র, ত্রয়োদশ সর্গ, সুভদ্রার উক্তি)

আবার,— "একজাতি মানব সকল;
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়।
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম্ম-সাধন;
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।" (রৈবতক, সপ্তম সর্গ)

পুনরায়,— "যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম্ম, শাসন নিষ্কাম কর্ম্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়! নহে পশুবল!" (রৈবতক, সপ্তদশ সর্গ)

এবং,— "শিখাব এক কর্ম্ম—এক জাতি, এক ধর্ম্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—

(রৈবতক, সপ্তদশ সর্গ)

ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনিতে পাই;—
"এক ধর্ম্ম এক জাতি, একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ডদেহ হবে না মিলিত।"

(রৈবতক, সপ্তদশ সর্গ)

এই স্থানে নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক মতামত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কবিবর ভারতে আর্য্য ভিন্ন অপর জাতি সমূহের সভ্যতা (অনার্য্য সভ্যতা) অস্বীকার না করিলেও তত সম্মান দেন নাই। ইহা ঠিক নহে। তিনি অনার্য্যদের মধ্যে শুধু যে নাগজাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা যে এদেশে খুব সভ্য ছিল এবং বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিত তাহার প্রমাণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও জাতক (পালী) গ্রন্থাদিতে পাওয়া গিয়াছে। এই নাগজাতি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারে। বৈদিক আর্য্যদের ভারতে আগমনের বহুপূর্ব্বে এই দেশে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও পামিরিয় (Pamirious) নামক জাতিগুলি বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবির পক্ষে বলা যায় তিনি ইতিহাস লেখেন নাই, কাব্য লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সময়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃতও হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—আর্য্য ও অনার্য্য শব্দের ব্যাখ্যা এবং তাহাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামত এখন অনেক বদলাইয়া গিয়াছে এবং "বর্ণাশ্রম" ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আধুনিক মত ও প্রাচীন মতে কিছুটা পার্থক্য আছে। নাগরাজ বাসুকির শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের বিপক্ষতাচরণের মনোহর কাহিনীটিও কবির নিজস্ব সৃষ্টি এবং আর্য্য-জাতির সহিত অনার্য্য নাগজাতির বিরোধের দ্যোতক। প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রীক জাতীয় নাগজাতির সহিত আল্পাইন (Alpine) জাতীয়, পামিরিয় (Pamirious) ও প্রটো-মেডিটেরানিয়ান (Proto-Mediterranian) জাতীয় দ্রাবিড়গণের যতটা সংঘর্ষ বাধিয়াছিল নর্ডিক (Nordic) জাতীয় বৈদিক আর্য্যগণের (Vedic Aryans) সহিত ততটা সংঘর্ষ বাধে নাই। বৈদিক আর্য্যগণের ন্যায় পামিরিয় ও দ্রাবিড় এই উভয় জাতিই ককেশিয় (Caucassians) নামক মানব জাতির অপর দুই শাখা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে এবং ইহারাও অষ্ট্রীক জাতীয় নাগগণ,

ইহাদের সকলেরই খুব উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক কবিবরের ঐতিহাসিক মূল মতামত সম্বন্ধে একপক্ষে যেমন তিনি এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকট ঋণী অপর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতের সহিত তাহার সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য ও চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে কবি তাঁহার কাব্যসমূহে এমন চমৎকার দৃশ্যাবলী ও কথার অবতারণা করিয়াছেন যাহা তুলনারহিত। আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রে গ্রথিত করিবার প্রচেষ্টার কথা অবগত আছি। এমন কি জাতি (Race) ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতির মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্য আনিবার চেষ্টার কথাও শুনিয়া থাকি। কিন্তু ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্য বুদ্ধি জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টায় কবি নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম সাধারণ সাম্প্রদায়িক অর্থে ধর্ম্ম (Religion) নহে। এই সাধারণ অর্থে কোন একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টায় জগতে মারামারি, কাটাকাটি অনেক হইয়া গিয়াছে। কবির "ধর্ম্ম" মানবতার ধর্ম্ম। ইহা মানুষের উদার হৃদয় এবং মূলগত অধিকার ও মৌলিক নীতিজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন। কবির নৈতিক ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে সমগ্র মানবসমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার স্বপ্ন অপূর্ব্ব। ইহা কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব না হইলেও মহান আদর্শের দিক দিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অহিংস নীতির সাদৃশ্যে বড়ই মনোরম মনে হয়। কবে কবির স্বপ্ন সফল হইবে জানি না। তবে কবির এই শুভ আকাঙ্ক্ষা ও কবিত্বময় প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বৈষ্ণবকবি নবীনচন্দ্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন,
সম্পাদক, "দেশ"।

নবীনচন্দ্র কৃষ্ণনাম মধুর করিয়া গিয়াছেন। এজন্ত তিনি আমাদের গুরুস্থানীয়। বালককাল হইতে কাননকুন্তলা চট্টলভূমির এই কৃষ্ণ-প্রেমিক কবির মুখের সুমধুর কৃষ্ণকথা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কবি যেদিন নিত্যধামে প্রয়াণ করেন, তখন 'বঙ্গবাসী'তে আমি সেই সংবাদ পাঠ করি। অন্তিম শয্যায় শায়িত কবির অঙ্গে তাঁহার বন্ধুগণ কৃষ্ণনাম লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনামের মালা অঙ্গে পরিয়া চিরনিদ্রায় নেত্র নিমীলিত করিয়াছেন ; এই বর্ণনা পাঠ করিয়া অশ্রু নিরুদ্ধ রাখিতে পারি নাই।

আমি বৃন্দাবন-লীলার অনুরাগী। কৃষ্ণলীলা আমার নিকট ইতিহাস নহে, তাহা বিলাস। তিনি ব্রহ্ম, সে ব্রহ্মকে জানিলে ভয় থাকে না ; রসময় সেই পরম পুরুষ তিনি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলিলে আমার চিত্ত তৃপ্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনের জন্য আসিয়াছিলেন, সে প্রয়োজন শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ কথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার চিন্ময় শ্রীঅঙ্গের সম্বন্ধে এমন মর্ত্ত্য ধারণা করিতে আমার মনে বেদনার সঞ্চার হয়। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণ 'সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ-করণ'। তাঁহার লীলা নিত্য লীলা এবং বৃন্দাবনের রাস রসকে আশ্রয় করিয়াই তিনি এই লীলা করিতেছেন। তাঁহার বৃন্দাবন লীলার অনুষ্ঠানে চিত্তে প্রেমের আবর্ত্ত উঠিলে বিষয় বিচারের উর্দ্ধে মানুষ আজও সেই নিত্যলীলার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ভাগবতে দেখিতে পাই উদ্ধব কৃষ্ণ লীলার এই নিত্যের দিকটার উপরই জোর দিয়াছেন। তিনি বিদুরের নিকট দুঃখ করিয়া বলেন,—

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্॥
ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ।
সাত্বতামৃষভং সর্ব্বে ভূতারামামমংসত॥

যদুবংশীয়েরা বড়ই দুর্ভাগা, তাঁহারা ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের বংশের কোন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়াই জানেন। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিময় যুগে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রভাবে আমরা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম যে কৃষ্ণ প্রধানতঃ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ, মহামানব বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আদর্শের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের আদর্শের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে উভয়ের সাধনাঙ্গের ভিতর যে পার্থক্য আছে, ইহা বোঝা যাইবে। নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে বৃন্দাবন লীলার আলোচনা করেন নাই ইহা ঠিক; কিন্তু বৃন্দাবনের চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাকে তিনি শুধু বিচার সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই, সে লীলার অবিতর্ক এক অনুপম মাধুর্য্য কবির সতর্ক মনের উপরও আসিয়া কার্য্য করিয়াছে এবং তাঁহার প্রমোদ-রসে তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। কবির শ্রীকৃষ্ণের মহামানব-লীলার পরিকল্পনার মধ্যেও বৃন্দাবনের বাঁশরীর মূর্চ্ছনা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। কবির মনে মায়ামানুষ চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পরম দেবতার প্রেমমাখা হাসি আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। কবির পরিকল্পনার মধ্যে আমরা তাঁহার প্রাণের দেবতার প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি করি। তিনি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের কাছে আনিয়াছেন। ব্রজলীলার ভাবরসে নিমগ্ন না হইলে ইহা সম্ভব হয় না; শুধু কুতোরই বিচারে স্মৃতি নিবদ্ধ থাকে নিত্যলীলার ইষ্টতত্ত্বে তাহা রস-পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং নামও মধুর হয় না; কারণ প্রত্যক্ষ রসলীলার দোলে চিত্তে

যে বোল উঠে তাহাই নাম; শুধু বিচারের দ্বারা নামের মধ্যে রস সঞ্চার করা সম্ভব হইতে পারে না। এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "আমার সকল কথা তোমার নাম দিয়ে দিয়ো ধুয়ে, আমার নীরবতায় তোমার নামটি রেখো ছুঁয়ে।" সুতরাং নামের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির সম্পর্ক রহিয়াছে, ভাগবতের মতে মনে ভাগবতী লীলার স্মিতস্পর্শে হর্ষময় যে সংবেদন জাগে, তাহার স্ফুরণই নাম। কবি সুভদ্রার চরিত্রে, শৈলের চরিত্রে কৃষ্ণনামের ভিতর দিয়া নিত্যলীলার রসমাধুরী বিতরণ করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের ঠাকুরকেই কুরুক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন এবং ব্রজ-মধুর প্রেমমাধুরীই সেখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যে এবং তারুণ্যে বিশ্বকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। যমুনার তীরে কি সুন্দর বন, কিবা শোভা প্রকৃতির! কিশোর গোপাল তিনি। কবির মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মনে, অবতারের চিত্তের কোণেও, বৃন্দাবনেরই এই স্বপ্নের আকর্ষণ রহিয়াছে। কবির শ্রীকৃষ্ণ লীলার গুরু সখা এইসব ভাবের মধ্যেও ব্রজ-লীলার এই গূঢ় মাধুরীর চাতুরী রহিয়াছে এবং তাহা কবির অন্তরে প্রেমের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণনাম মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আমাদের মনন-রাজ্যে কৃষ্ণলীলায় নিত্যলীলার প্রেম-মাধুর্য্যের শক্তি পাইয়াছি। কবি কৃষ্ণলীলার রসে মজিয়াছেন, গলিয়াছেন। তাই অশ্রুসিক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম গাহিয়াছেন এবং এই নামটিকে মধুর করিবার জন্যই তো কৃষ্ণলীলা। আমরা ভাগবতে কুন্তীদেবীর কৃষ্ণস্তোত্রে দেখিতে পাই, তিনি কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের বিচার করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্॥

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্॥
ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরি ভারেণ জাতোহ্যাত্মভুবার্থিতঃ॥
ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন॥

অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ কামকর্ম অভিভূত, প্রেমের মর্ম তাহারা বোঝে না, মানবধর্ম তাহারা জানে না। তোমার নামটি তাহারা যাহাতে শ্রবণ করে এবং স্মরণ করে, সে জন্যই তোমার এই অবতার-লীলা। কবি নবীনচন্দ্র কৃষ্ণনাম আমাদের কাছে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণলীলার গূঢ় রহস্যের রাজ্যেই তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, নতুবা শুধু অনুমান বা বিচারের বলে তাঁহার পক্ষে নাম মধুর করা সম্ভব হইত না। যাঁহারা কৃষ্ণ নামে এমন শ্রবণ মঙ্গল পরায়ণ তাঁহারা বৃন্দাবন বাসী, ভাগবতের ইহাই বাণী, গীতাতেও শ্রীভগবান নিজেই সে কথা বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্য জন্ম কর্ম্মের রহস্য অধিগত হইয়াছিলেন এবং ভক্তির পথেই তাহা সম্ভব—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" নিত্যধামবাসী এই পরম বৈষ্ণব এবং ভক্ত কবির শ্রীচরণে আমি আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ নিবেদন করিতেছি।

নবীনচন্দ্র

অধ্যাপক—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম,এ

নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার মধ্যে যে জিনিষটি সবচেয়ে বেশী করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে তাঁর মানবজীবনকে এবং বহির্জগৎকে দেখবার ও দেখাবার আধুনিক ভঙ্গী।

এই নূতন ভঙ্গীটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' নামক তিনখানি কাব্যে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দেয় না।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠ; আর নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে জীবননিষ্ঠ। আদর্শের চেয়ে জীবন অনেক বিচিত্র, অনেক রহস্যময়; অনেক জটিল এবং সূক্ষ্ম। জীবনের মধ্যে আদর্শের একমুখী গতি নেই, আছে বহুমুখী গতির উদার বিচিত্রতা। এই জীবনধর্ম্মী কবিদৃষ্টি হচ্ছে সেই জিনিস ইংরেজিতে যাকে বলে life view.

এই life view, এই জীবনধর্ম্মী কবিদৃষ্টি নিয়ে মানবজীবন তথা মানবচরিত্রকে দেখলে দেখা যায়, সেখানে বিচিত্রতার অন্ত নেই,—কর্ম্মের বিচিত্রতা, চিন্তার বিচিত্রতা, অনুভূতির বিচিত্রতা, ধ্যান-ধারণা, বাসনা-কামনার বিচিত্রতা।

মানবজীবন তথা মানবচরিত্রকে সমগ্রভাবে দেখবার এই প্রয়াস মধুসূদনে নেই, হেমচন্দ্রে নেই। এঁদের প্রতিভা হচ্ছে ভাস্কর্য্য-ধর্ম্মী প্রতিভা, স্থাপত্য-ধর্ম্মী প্রতিভা। এ প্রতিভা সুন্দরকে খুঁজেছে পরিপূর্ণ গঠন-সামঞ্জস্যের মধ্যে। সেখানে এতটুকু ফাঁক নেই, অবকাশ নেই,

আছে কেবল নিটোল, নীরন্ধ্র সামঞ্জস্য। তাই unity of tone ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় কথা।

প্রাচীনপন্থী নাট্যকারদের সঙ্গে আধুনিক নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাত দেখাতে গিয়ে Moulton একস্থানে বলেছেন—'Ancient tragedy clung to unity of tone and excluded such matter as threatend to set up a second interest in a play. Modern plot has a unity of much more elaborate order, a harmony of distinct actions, each of which has its separate unity.'

এ হচ্ছে অনেক বড় সামঞ্জস্য, অনেক সূক্ষ্ম, অনেক জটিল, অনেক বেশী গভীর। এর জন্যে দরকার বৃহত্তর মানবজীবনের, যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য, diversityর মধ্যে রয়েছে unity.

একে ঠিক unity না বলে harmonyর নাম দিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। এটা unity of tone নয়, এটা হচ্ছে harmony of design—যা আদর্শের মধ্যে ধরা দেয় না, ধরা দেয় বিরাট মানব জীবনের বিচিত্রতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

বিচিত্র মানব জীবনের বিরাট ক্ষেত্র থেকে খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে সমধর্মী ঘটনা, কর্ম, চিন্তা ও অনুভূতিগুলিকে গ্রহণ করে এবং যা কিছু এদের স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে না, তাদের যত্নপূর্বক বাদ দিয়ে; বর্জন করে যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়, তার মধ্যে ভাস্কর্য শিল্পের নিবিড়তা, ঘনত্ব ও গাঢ়তা থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া যায় না চিত্রশিল্পের সেই বর্ণবৈচিত্র্য, রং ও রেখার সেই বিচিত্র আলো-ছায়ার লীলা, যা অনেক বেশি সূক্ষ্ম, রহস্যময় এবং প্রাণচঞ্চল।

মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' এবং হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' হচ্ছে Neo—classic যুগের tragedy-র ছাচে-ঢালা, যা আগাগোড়াই

bold এবং statuesque অর্থাৎ স্পষ্ট এবং স্থির সৌষ্ঠব।—যার মধ্যে গঠন-সামঞ্জস্য একেবারে নিটোল এবং নীরন্ধ্র।

নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'-কাব্যের গঠন-কৌশল এবং অঙ্গ-সামঞ্জস্য কিন্তু আদৌ স্পষ্ট এবং নিটোল নীরন্ধ্র নয়।—গাঁথুনি যেন আল্গা-আল্গা, ছাড়া-ছাড়া।

আসল কথা, নবীনচন্দ্র হচ্ছেন সেই শ্রেণীর কবি যাঁরা unity of tone-এর চেয়ে unity of design-কে অনেক বড় করে দেখেছেন। এঁদের সামঞ্জস্যবোধ ছন্দসুষমার উপর যত না নির্ভর করে, তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে ভিতরকার গভীরতর তাৎপর্য্যের উপর।

নবীনচন্দ্র এই unity of design তাঁর কাব্য-তিনখানির মধ্যে সকল ক্ষেত্রে বজায় রেখে চলতে পেরেছেন কি না সে আলোচনা আজ করতে চাই না, অন্ততঃ এ প্রবন্ধে নয়। আজ শুধু কবির দৃষ্টি-ভঙ্গির নূতনত্ব সম্বন্ধে দু-চার কথা সংক্ষেপে বলতে চাই। আজ শুধু এই টুকুই দেখতে চাই যে, মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের পথ থেকে নবীনচন্দ্র অনেকখানি সরে এসেছেন এবং যে নূতন পথে তাঁর কবিপ্রতিভাকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন, সে পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ।

তাঁর মনের গঠনটাই যে ছিল অন্য ধরণের, কাজেই প্রকাশের পথ স্বতন্ত্র না হয়ে পারে না। এই মনটা গড়ে উঠেছিল সেই যুগের আবহাওয়ায়, যে যুগ শুধু নিজের সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে প্রকাশ করতে চায়নি, চেয়েছে নিজের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে, যে ব্যক্তিত্ব সেই যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-কৃষ্টি, ধ্যান-ধারণাকে শুধু বাইরে থেকে ভাসা-ভাসা ভাবে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছে গভীর ভাবে। আকৃতিধর্ম্মের দিক থেকে নয়, খাস্ প্রকৃতিধর্ম্মের দিক্ থেকে।

আকৃতিধর্ম্মকে অনুকরণ করা যায়, কিন্তু প্রকৃতধর্ম্ম জীবনের মূলে দেয় নাড়া। শুধু সৌন্দর্য্য চেতনাকে নয়, সমগ্র ব্যক্তি চেতনাকে

সে আলোড়িত করে তোলে। তখন তার আর থেই পাওয়া যায় না। তখন তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিকে নিজের পথ নিজেকে গড়ে দিতে হয়।

মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র মানব জীবনকে দেখেছেন হোমার, মিলটন, দান্তের চোখ দিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে যেখানে, সেখানে পথনির্ব্বাচনের মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে মানুষটির দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদলে, তিনি কেমন করে গতানুগতিক পথে চলবেন ?

এ পথ চলায় ভুলচুক আছে, বাধাবিঘ্ন আছে, বিপথে যাবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু উপায় নেই ;—এইটাই যে তাঁর একমাত্র পথ, তা সে যত আঁকাবাঁকা হউক না কেন। দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদলে, অথচ পথটা থেকে গেছে সনাতন, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে ?

কাব্যের নায়ক-নির্ব্বাচনের দিকে একটু নজর করলেই বোঝা যায়, নবীনচন্দ্রের বাসন-কামনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনা কোন্ নূতন পথে যাত্রা সুরু করেছে।

এত বিষয় থাকতে তিনি বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে বসলেন কেন? মধুসূদনের মত মেঘনাদ-বধ অথবা হেমচন্দ্রের মত বৃত্রসংহার ধাঁচের জমাট কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করতে পারতেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা যে অনেক বেশি জড়ানো এবং বিক্ষিপ্ত সে কথা কে অস্বীকার করবে?

এইখানেই হয়েছে আসল তফাৎ। মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র যে যুগেই জন্মান না কেন, তাঁদের মনের গঠনটা ছিল সেই যুগের কবিদের সমধর্ম্মী, যে যুগের কবিরা মহাকাব্য রচনা করতেন বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শোনাবার জন্যে।

নবীনচন্দ্র হচ্ছেন সেই যুগের কবি, যে যুগ মানুষকে ভাবিয়েছে,

চিন্তিত করে তুলেছে; মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা, নানা সমস্যা। এ হচ্ছে সেই যুগ, যে যুগ বিশেষ করে আত্মপ্রকাশ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর দিয়ে। এ হচ্ছে সেই যুগ, যে যুগের কবি প্রাচীন যুগের বীরত্বের কাহিনী শোনাতে চায়নি, চেয়েছে নিজের যুগের আধুনিকতম চিন্তা প্রশ্ন ও সমস্যাগুলিকে রূপ দিতে।

এদিক থেকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কবিকে যতটা সহায়তা করতে পারে, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোন চরিত্রই তা পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র এত বিরাট, এত বিচিত্র এবং রহস্যময় যে সেখানে সব কিছুই খাপ খেয়ে যায়।

Moulton একস্থানে বলেছেন—The print of modern life is marked by its comprehensiveness and reconciliation of opposites. সে হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র প্রাচীন ও পৌরাণিক হয়েও এত আধুনিক, এত comprehensive যে তার মধ্যে সব-কিছুরই reconciliation সম্ভব, সব কিছুই খাপ খেয়ে যায়। মেঘনাদ বা বৃত্রাসুরের চরিত্রে সে সম্ভাবনা কোথায়?

মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র শৌর্যবীর্যের কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন;—তাঁদের যুগের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাকে রূপায়িত করে তুলতে চাননি। তাই মেঘনাদ এবং বৃত্রাসুরের জীবনকথাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নবীনচন্দ্রের দরকার হয়েছিল এমন একটি মানবচরিত্রকে, যার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর যুগের চিন্তা ও জিজ্ঞাসা-গুলিকে রূপদান করতে পারেন।

ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে নূতন করে কৃষ্ণচরিত্র লিখতে হয়েছিল। তাঁর মনের মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল। ধর্ম কি?—মনুষ্যত্ব কি? পাপ-পুণ্য কি?—মানুষের

নৈতিক আদর্শ কি?—এমনি নানা প্রশ্ন। এসকল প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও কৃষ্টির সংঘাতের ফলে—যে সংঘাত সেই যুগের শিক্ষিত মানুষের মনকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। এ সংঘাত প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যিক আকৃতি-ধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত-প্রসূত নয়,—এ সংঘাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাগত মূল প্রকৃতিধর্ম্মের সংঘর্ষ-প্রসূত।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে এমন একটি চরিত্র খুঁজে নিতে হয়েছে যার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু সমস্যার সমাধান সম্ভব; যার ভিতর দিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক সকল কিছু জিজ্ঞাসার মীমাংসা হতে পারে।

নবীনচন্দ্র

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, এম্,এ

প্রকৃতির দুরন্ত সন্তান নবীনচন্দ্র দুরন্ত হৃদয়াবেগ, অফুরন্ত কল্পনাশক্তি এবং অলৌকিক তেজবীর্য্য লইয়া কাব্যজগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের বিরাটত্ব এবং সমুদ্রের গভীরতা ও অসীমতা যেন তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত বন্য প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় ছাপ তাঁহার কাব্য প্রতিভার উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন কাব্য রচনায় নবীনচন্দ্র বায়রণের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং বায়রণের উচ্ছৃঙ্খল অসংযত ভাবপ্রভাব তাঁহার সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বায়রণ কাব্যকলাকে ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্বালাময়ী কল্পনারংে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে সাজাইয়াছিলেন—। অশান্ত হৃদয়াবেগ অসংযমী উচ্ছ্বাস এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাব্যরচনা ও কল্পনার

দুরন্ত প্রসার প্রভৃতি দোষগুণ হয়ত সত্য সত্যই কবি নবীনচন্দ্র বায়রণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বায়রণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব হইতেছে সত্যকে কল্পনার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া কায়াকে ছায়ার সহিত মিলাইয়া মহৎ কিছু সৃষ্টির প্রয়াস। সামান্য উপকরণের উপর অসামান্য কল্পনা জাল বিস্তার করিয়া তিনি এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিতেন যাহা অন্য কোনও কবির পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে ভাবধারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাতীয় জীবন, সমাজ ও সাহিত্যে নূতন ভাবের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল নবীনচন্দ্রও সেই ভাবধারায় স্নান করিয়া নূতন ভাবাদর্শ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতীয় প্রাচীন আদর্শভূমির উপর নূতন সৃষ্টির বীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে মনুষ্যত্বের নূতন ভাবপ্রেরণা এবং মনুষ্যত্বের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রভাস, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ দেব-বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য লইয়া দেখা দেন নাই; মহামানবের মহান ঐশ্বর্য্য লইয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার নহেন—মানবতার মহান আদর্শের পূর্ণ প্রতীক। মানুষের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানুষের অনন্ত কর্ম্মপ্রেরণা ও কর্ম্মশক্তি, জাতীয়তাবোধের পূর্ণ আদর্শ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে বিরাট ও মহান করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞান-ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়ে এই শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক—এই শ্রীকৃষ্ণ মানবগীতার মূর্ত্ত প্রতীক।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্যেই নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্ব জাতীয় ভাব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—আত্মকলহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডবিখণ্ডিত ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এক অখণ্ড ঐক্যস্থাপনই এই তিনখানি কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র সাধনা ও কামনা। আর্য্য ও

অনার্য্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে এই আত্মকলহের পটভূমিকাটি রচিত হইয়াছে। বিজয়ী আর্য্য বিজিত অনার্য্যের উপর ঘৃণাপরায়ণ—তাহার ফলে উভয়ে উভয়ের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং পরস্পর বিদ্বেষী। এই বিদ্বেষ জাতিগত উন্নতির প্রতিবন্ধক এবং রাষ্ট্রগত ঐক্যসাধনের পথে একান্ত অন্তরায় স্বরূপ। আর্য্যদের স্বকীয় সমাজও বিভক্ত—ব্রাহ্মণের দম্ভ ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে নিপীড়িত নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের পূর্ণ প্রকাশের পথে বিঘ্নস্বরূপ—তাহাদের অভ্যুত্থানের পথে কণ্টকস্বরূপ। এই বিভেদ ও বৈষম্য সমাজ-দেহে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রগুলিকে পঙ্গু ও খণ্ডিত করিয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া হিমাচলের ন্যায় দণ্ডায়মান। নবীনচন্দ্র ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতিগত সাম্য এবং রাষ্ট্রগত ঐক্য স্থাপিত না হইলে ভারতের পূর্ণ অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। তাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ এক অভিনব জাতীয়ভাবদীপ্ত পুরুষ মূর্ত্তি লইয়া ভারতের মানুষকে নূতন গীতা শুনাইবার জন্য—নূতন কর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, ঐক্য ও সাম্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়-জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রগত অধঃপতন মুখ্যত নবীনচন্দ্রের কবিমনকে স্পর্শ করিয়াছিল। মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যানবস্তুটীকে সম্মুখে রাখিয়া নবীনচন্দ্র তাই তাঁহার স্বকীয় ভাব কল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মগত অনৈক্য ও বিভেদ দূরীভূত না হইলে ভারতের তথা বিশ্বের সত্যকার মুক্তি কোনদিনই সম্ভব হইবে না। তাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণও এই সকল চিন্তাতেই বিচলিত। এই বিভেদ ও এই বৈষম্যকে দূর করিয়া ভারতবাসীকে সাম্য ও একতার সূত্রে বাঁধিয়া দিবার চিন্তাতেই শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেলিত। রৈবতকে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"একাকী নির্জ্জনে এক তরুছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি,—জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব; একই শরীর,
একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল,
জন্ম মৃত্যু একরূপ, তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?
চারি বর্ণ; চারি বেদ; দেবতা তেত্রিশ,
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর।"

বাল্যস্মৃতিতে যে শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবনায় অভিভূত সেই বালক শ্রীকৃষ্ণই কল্পনা-নেত্রে আবার এক অখণ্ড মহাভারতের রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন—

—এক জাতি মানব সকল;
এক বেদ— মহাবিশ্ব অনন্ত অসীম,
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়—
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম্ম সাধন;
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।"

এই ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"শিখাব একত্ব মর্ম্ম,—এক জাতি এক ধর্ম্ম,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা রাজা নারায়ণ!"

এই সাম্য ও ঐক্যের পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতের চরিত্রগুলিকে এই নবভাবে ঢালিয়া সাজিয়া যে, নবীনচন্দ্র স্বকীয় ভাবকল্পনাকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এই ভাব কল্পনাকে নব আদর্শের রূপ দিবার প্রয়াসের জন্য অনেকে নবীনচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই কারণে "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" তিনখানি কাব্যই কবির জীবদ্দশায় সাধারণের মনে নূতন চিন্তাধারার চাঞ্চল্য আনিলেও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে যে পত্র লেখেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"তুমি সত্য সত্যই এক অভিনব মহাভারত সূচনা করিয়াছ—অতি দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য্য। হরিবংশ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ রচনার পর তুমি ভিন্ন আর কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য্য করে নাই।

কিন্তু সাবধান, কৃতকার্য্য হইবে এ আশা বড় রাখিও না। আমার মতে ইহাতে তোমার যশ অল্পই হইবে। যদি রচনা সুচারু হয় অনেকে হয়ত উহাকে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত বলিবেন, আবার অন্যে ইহাকে মহাভারতের রহস্যানুকরণ বলিয়া উপেক্ষা করিবে।

শেষ কথা, তোমার কাব্য কি ইতিহাস ও রাজনীতির অনুগত হইবে? আমি ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসের সহিত কাব্য সম্পর্কহীন করিতে বলিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসের বিপরীত করিতে বলিতে পারি না। অবশ্য কাব্যোক্ত চরিত্রাঙ্কনে তাহাও করিতে পার।" বঙ্কিমচন্দ্র কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া যে আশঙ্কা করিয়া কবিকে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা একেবারে ভিত্তিহীন আশঙ্কায় পরিণত হয় নাই। তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী কবিকে সত্যসত্যই যথোপযুক্ত যশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।

এই তিনখানি কাব্য সম্বন্ধে শশাঙ্কমোহন সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যকে আরো সুস্পষ্ট করিতেছি—

"ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক তথ্য, কল্পনা ও গবেষণা, সৃষ্টি ও আবিষ্কার একাকার করিয়া এই বিপুলায়তন কাব্যত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে।

বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের জাতীয় সংঘর্ষ, ফরাসী বিপ্লব, এ্যাবটের নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, চিন্তাদগ্ধ মেরী আন্টনিয়েট, মানব-হিতৈষিণী ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি সকলেই এই মহাকাব্যের উপকরণ যোগাইয়াছেন। আবার ইহাদের ঐতিহাসিক প্রকৃতিও নিরবচ্ছিন্ন শিল্প আদর্শের প্রকৃতি নহে। উহারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজের কোনরূপ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিতে চাহে নাই, উহাদের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রচারের প্রচেষ্টাই রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে জাগ্রত হইয়া পূর্ব্বকালের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক পরিচ্ছদ অবলম্বনে এই কাব্য পরিস্ফুরিত। ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, সাম্যভাব, মৈত্রী, দাসত্বপ্রথা, বিবাহপ্রথা, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সমস্যাসমূহের বিচার বিতর্ক এবং কবির আত্মমতানুযায়ী সিদ্ধান্তে এই কাব্য মুখরিত হইয়াছে।"

কিন্তু, ইতিহাস ও কাব্য এক নয়। কাব্যের যাহা প্রাণধর্ম্ম ইতিহাসে আমরা তাহা পাইনা—পাইবার কথাও নহে। ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায় কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া যে তাহাকে একনিষ্ঠভাবে ইতিহাসকে অনুসরণ করিতেই হইবে তাহার কোন বাঁধাধরা প্রয়োজনও নাই। কাব্য অনেক সময়ে নূতন ইতিহাস রচনা করে। পাঠকের ও শ্রোতার ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নূতন পথে পরিচালিত করে। ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ মাত্র, কিন্তু, কাব্য হইতেছে নূতন সৃষ্টির প্রয়াস।

নবীনচন্দ্রের পূর্ব্বে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি আমাদের পুরাতন ভাবধারাকে নূতন পরিকল্পনায় নূতন মূর্ত্তিতে সাজাইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত চেতনা নূতন ভাবাদর্শে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয়ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি বাঙ্গালীকে নূতন আদর্শের পথে আগাইয়া দিতে

চাহিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের সৃজনীশক্তি মানবধর্মকেই জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। সুতরাং কবি ইতিহাসের পটভূমিকায় কল্পনাকে ও স্বীয় ভাবাদর্শকে উদ্দাম গতিতে বেগবান করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই কারণে অনেক সময়ে ঐতিহাসিক সত্যটি হয়ত চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কবির লক্ষ্য ইতিহাসের রস-টুকুর উপর। ঐতিহাসিক ঘটনার উপর অনাস্থা স্থাপনের জন্য এবং অত্যধিক কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার জন্য কোন কোন সমালোচক কবিকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। "পলাশীর যুদ্ধ" সমালোচনা কালে সমালোচকগণ কবিকে দোষারোপ করিয়াছেন অনৈতিহাসিকতা অবতারণার জন্য। কিন্তু, মোহনলালের চরিত্রে যে জীবন্ত জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা আর কোথায় মেলে?

যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত মোহনলালের শেষ নিঃশ্বাস পড়িবার পূর্ব্বে যে ক্ষেদোক্তি তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে সমগ্র ভারত তথা বাংলার অধঃপতিত জাতীয়তার ক্রন্দন যেন আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে—

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ রজনী।

★ ★ ★ ★

কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী!
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয় গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।

যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন হিন্দু চিত্ত নাহি—নিরাশ সদন—
হ'য়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত ?

★ ★ ★ ★

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধু জলে ?
যাও তবে যাও দেব কি বলিব আর,
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গ-উদয় অচলে।
কি কাজ বল না আহা! ফিরিয়া আবার ?
ভারতের আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ!"

মোহনলালের এই খেদোক্তির ভিতর দিয়া কবিচিত্তের মর্ম্মব্যথা উছলিয়া উঠিয়াছে। "পলাশীর যুদ্ধ" বাংলার ইতিহাসকে যে রূপ দান করিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অপেক্ষা কোন অংশে নিন্দনীয় নহে।

সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে কবির আশা, আকাঙ্ক্ষা, শৌর্য্য বীর্য্য, হর্ষ বিষাদ উন্মাদ তরঙ্গমালার মত গতিবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে কবির মানস-হৃদয়টি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। সংযমের বাঁধ হয়ত শিথিল হইয়াছে, আবেগ ও উচ্ছ্বাস হয়ত কাব্যরীতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবির হৃৎস্পন্দন যেন পাঠকের হৃৎস্পন্দনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

"কাঁপাইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া গঙ্গাজল—
কাঁপাইয়া আম্রবন" বৃটিশের রণবাদ্য এবং কামান গর্জ্জন যখন—

বাঙ্গালায় স্বাধীনতা সূর্য্যকে চিরদিনের জন্য অস্তগত করিয়া দিল, তখন কবিচিত্তের যে শোকচ্ছবি কাব্য মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে আমাদের জাতীয় জীবনে যে মসীকৃষ্ণ কালিমা আলেপিত হইয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ছত্রে ছত্রে। কাব্যের সকল দোষ ত্রুটি এইখানেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। জীবন্ত প্রাণ-স্পন্দনের অপরূপ অভিব্যক্তি সমস্ত কাব্যখানিকে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে।

নবীনচন্দ্র অদৃষ্টবাদী—গীতিপ্রবণতার আশ্রয়ে এই অদৃষ্টবাদ তাঁহার প্রায় সকল কাব্যের মধ্যেই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মানব জীবনের পিছনে, অদৃশ্য অন্তরালে অবস্থান করিয়া এক মহাশক্তি কাজ করিয়া যাইতেছে—এই শক্তিকে মানুষ কোন প্রকারেই করায়ত্ত ও বশীভূত করিতে সমর্থ নহে। এই শক্তিই নিয়তি—ইহার মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর দেবতা আর নাই। কবি এই নিয়তিকে মহিমান্বিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। মানুষের অদৃষ্টবাদ তাঁহার কাব্যে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রভাস, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি সকল কাব্যেই এই শক্তিময়ী নিয়তি স্বেচ্ছাচারিতার নির্ম্মম রথ চালাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—মানবের অদৃষ্ট তাহার করায়ত্ত। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ যিনি [illegible]—[illegible] শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি, তিনিও এই নিয়তির নিকট পরাভূত—তিনিও এই নিয়তির বিধানকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। নিয়তির প্রভাবকে শ্রীকৃষ্ণকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।—

"মানবের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত!
কি ঘটিবে কোথা হ'তে মুহূর্ত্তের পরে
নাহি জানে অন্ধ নর। দেখিয়াছ তুমি;
মানবের কত মহাকার্য্যের তরণী

উড়াইয়া বৈজয়ন্তী পাইয়াছে কূল ;
একটি ঘটনা উর্ম্মি, আসি আচম্বিতে
অমনি অতল গর্ভে ডুবাইল তারে—
হে কৃষ্ণ অদৃষ্ট কেন মানিবে না তবে ?
দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে ;
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য ; চল সেই পথে।
ততোধিক মানবের নাহি অধিকার।"

নবীনচন্দ্র ভাবুক কবি—তাঁহার এই ভাবপ্রবণতা রোমাণ্টিক কাব্যের ধর্ম্মানুযায়ী। তাঁহার ভাবাবেগ ও কল্পনার প্রসারতা সীমার গণ্ডিকে অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সংযম ও নিরষ্ঠ অভাব তাহার জন্যই হয়ত অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। একবার উচ্ছ্বাস আরম্ভ হইলে নবীনচন্দ্র থামিতে জানেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ভাবাবেগে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া আসেন ; বর্ণনা আরম্ভ করিলে থামিবার লক্ষণ তাঁহাতে নাই—দৃশ্যের পর দৃশ্য তিনি অঙ্কিত করিয়া চলেন। শিল্পসংযম ও গাম্ভীর্য্যের অভাব অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার কবিপ্রতিভাকে খর্ব্বিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু, তাঁহার অনাড়ম্বর সহজ সরল ভাষা, ছন্দের ঝঙ্কার এবং বর্ণনার মাধুর্য্য এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যকে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। ভাষার মনোহারিত্বায়, গীতিপ্রাণতার মূর্চ্ছনায় তাঁহার বহু দোষ ত্রুটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শশাঙ্কমোহন সেন নবীনচন্দ্রের দোষ ত্রুটির আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন "ইতিহাসকে প্রাচীন আর্য্য রীতির মহাভারতের আদর্শকে আধুনিক হিন্দুর ভাবুকতা লইয়া অন্তরঙ্গভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা, প্রাচীন অবতারবাদকে বিশ্বজনীন ভাবে বুঝিবার জন্য এত বড় প্রকাণ্ড এবং

জীবনব্যাপী সাধনা, এদেশে অপর কোন কবির মধ্যে এত উদগ্র হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। * * * * * * * * * ভাষাকে সুস্থির উদ্দেশ্যে পরিমার্জ্জিত করিয়া ভাবকে সর্ব্বকালের পাঠকের ন্যূনাধিক মানান সই করিয়া মূর্ত্তিমান করার জন্য যে তাঁহার যথোচিত ধৈর্য্য কিংবা কারুকারিতা ছিল না তাহা প্রতিক্ষণেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। মনে হইতে থাকে যে এই কবি এক নিঃশ্বাসেই হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা বেদনা ভাষামুখে প্রবাহিত করিয়া দিতেছেন। এরূপ নিশ্চিন্ত নির্ভিক হৃদয় ধর্ষিতা, অহমিকা, আত্মপ্রকাশ এবং আত্মপ্রসাদ জগতে একা Byron ব্যতীত অন্য কোন কবির বেলায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে কিনা সন্দেহ।”

কাব্যজগতে জাতীয়তাবাদকে প্রথম স্থান দেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, পরবর্ত্তীকালে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেই জাতীয়তাবাদকে তীব্রতর রূপ দিয়া বাঙালীর সুপ্ত জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাসে নবীনচন্দ্র জাতীয় জীবনকে শুদ্ধ পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু, পলাশীর যুদ্ধ রচনা করিয়া তিনি সমগ্র জাতিকে এক বিরাট অন্ধ তমসার মধ্য হইতে টানিয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন। সিরাজের পতনের সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য্য চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কি এবং কাহার পাপে এত বড় অধঃপতন ভারতের আকাশকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি শোকাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তীব্র বেদনায় তাঁহার অন্তর ব্যথিত ও মথিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিয়োগান্ত কাব্য রচনায় কবি নিজের হৃদয় ভাবকে সমগ্র জাতির বুকে ছড়াইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। গভীর নৈরাশ্যে কবির মন প্রাণ রিক্ততার

হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া পাঠক সমাজকেও সেই নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন করিয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন গেটে এবং শিলারের "Sorrows of Werther" এবং "Robbers" এর ছায়া এবং বাইরণের বিদ্রোহী আত্মা নবীনচন্দ্রকে এই বিয়োগান্ত কাব্য রচনায় প্রভাবিত করিয়াছে। হয়ত এই উক্তির মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কবির "অবকাশ রঞ্জিনীর" উপরই হয়ত উপরোক্ত প্রভাব বেশী কার্য্যকরী হইয়াছে। "পলাশীর যুদ্ধে" বাইরণের "Child Harold" কিছু প্রভাব যে না রাখিয়াছে তাহা বলা যায় না। কারণ পলাশীর যুদ্ধের কোন কোন ছত্র হুবহু Child Harold এর অনেক ছত্রের সহিত এত সাদৃশ্য-যুক্ত যে তাহাদের অনুবাদ আখ্যা দিলেও দোষের হয় না।

পলাশীর যুদ্ধের চতুর্থ সর্গে নবীনচন্দ্র বাংলার বীর সেনানীদের মৃত আত্মার উদ্দেশে ক্ষেদ করিয়া বলিতেছেন—

"কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন কুতূহলে ;
প্রভাতে সমর সাজে সাজিল সকল ;
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে,
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর কুন্তল
সায়াহ্নে শায়িত হল অনন্ত শয়নে।
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন !"

উপরোক্ত ক্ষেদবাণীর সহিত বাইরণের Child Harold এর Canto III, XXVIII এর সৌসাদৃশ্য অনুধাবন যোগ্য—

Last noon beheld them full of lusty life,
Last eve in Beauty's circle proudly gay,
The midnight brought the signal sound of strife,
The morn the marshalling in arms—the day
Battle's magnificently stern array !
The thunder-clouds, close o'er it, which
when rent
The earth is cover'd thick with other clay
Which her own clay shall cover, neaped and pent
Rider and horse—friend, foe—in one red
Burial blent !

আর একজন সমালোচক সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছেন—"Sirajuddowla, though a shadowy character in the epic, cannot stand on his own legs. To be a tragic figure he must dream his dreams in the style of his consin Shakespears' Richard III".

বাস্তবিক পক্ষে রিচার্ড এবং সিরাজের স্বপ্ন দর্শনের মধ্যে অ[illegible]ত এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য এত অধিক যে নবীনচন্দ্রের বর্ণিত স্বপ্ন-কাহিনীকে অনুবাদই বলিতে হয় (পলাশীর যুদ্ধ তৃতীয় সর্গ এবং Richard act VIII, দর্শনীয়)—কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হয় নবীনচন্দ্র নিজের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কোথাও হারাইয়া ফেলেন নাই। সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক অপূর্ব্ব বিপ্লবের গান তিনি গাহিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত, বহু পাশ্চাত্য কবির কাব্য সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন, তাহার ফলে হয়ত একটু আধটু পাশ্চাত্য কবিদের সহিত তাঁহার কাব্যের সাদৃশ্য ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য কবি-

প্রতিভাকে নিন্দা করা চলে না। পলাশীর যুদ্ধে কবির উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। পলাশীর যুদ্ধ বাঙালী পাঠক সমাজকে নূতন ভাবাদর্শে এবং নূতন কর্ম্মাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে—ইহাই বোধ করি যথেষ্ট সার্থকতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসে নবীনচন্দ্র নূতন মানবগীতার জয়গান করিয়াছেন। মানবতার হোমশিখা জ্বালাইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নর-নারায়ণরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অবতারবাদ কবি বিশ্বাস করেন না—নিছক দেবত্ব আরোপ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠপতি নিশ্চল দেবতারূপে অঙ্কিত করেন নাই। জীবন, সত্য এবং প্রেম এই তিনটির সংমিশ্রণে তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। মহামানবের জয়গান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে এই তিনখানি কাব্যের মধ্য দিয়া।

পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে মধুর ভাবের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে কতকটা মানবীয় মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও দেবত্ব আরোপের প্রচেষ্টা লুক্কায়িত হয় নাই। দেবতাকে মানব করিয়া অঙ্কন করার প্রচেষ্টাই তাহার মধ্যে সমধিক। কিন্তু নবীনচন্দ্র মানবকে দেবতার পীঠস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া। রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন বৈষ্ণব কবিতা শীর্ষক কবিতায় করিয়াছেন—

> "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
> পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান
> অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন
> বৃন্দাবন গাথা,—এই প্রণয় স্বপন
> শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে
> চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে

সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম তৃষা ?”

তাহার সমাধান যেন ওতপ্রোত ভাবে নবীনচন্দ্রের এই তিনখানি কাব্যের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন—তিনি মর্ত্ত্যবাসী মানব, এবং মানবতার পূর্ণ আদর্শ তাঁহার মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া এবং কর্ম্মের মূর্ত্ত আধার এই শ্রীকৃষ্ণ। মানবের সকল দোষ ক্রটী, মহত্ব, দুর্ব্বলতা সব কিছুর সমাবেশে এই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র গঠিত। এই জন্যই তিনি আদর্শ মানব, এইজন্যই তিনি ভারতবাসীর পূজ্য এবং নমস্য। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানবকুলের যেন আদর্শ প্রতিনিধি। একজন সমালোচক বলেন— “কবি মনে করেন এই মনুষ্যত্বের পূর্ণতায়ই মানুষ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেই আত্মোপলব্ধির ভিতরে, অনন্তশক্তি ও প্রসারের ভিতর দিয়া সেও অসীম, অনন্ত—সেও বিরাট, তাই সে ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের পূর্ণাবতার নহেন—তিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ,—তাঁহার আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়াই তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতে পারেন, তিনিও ব্রহ্ম—ইহাই কবির ‘সোঽহম্’-বাদ”।

নবীনচন্দ্র যে অবতার বাদে বিশ্বাসী নন, তাহা তাঁহার অমিতাভের ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তিনি বলিতেছেন—“পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন

আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়"। বাস্তবিক পক্ষে নবীনচন্দ্র বুদ্ধদেবকে অঙ্কিত করিয়াছেন সম্পূর্ণ মানবিক পরিবেশ দান করিয়া। এই স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং দুঃখ কোলাহল পূর্ণ পৃথিবীতে যেন নিরাশের ভিতর আশার আলো, অশান্তির ভিতর শান্তির বাণী ছড়াইতেই অমিতাভের আবির্ভাব। নবীনচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার অমিতাভ চরিত্রকে ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। মানবতার জয়গানের মধ্যে কবির মানবধর্ম্ম, মানবপ্রীতি এবং মানবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে অবতারবাদ ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে অতিরঞ্জনের রঙে রঙিন হইয়া উঠিয়াছিল, কবি তাহার মধ্যে এক নূতন আলোকপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধচরিত্রকে মহৎ মর্য্যাদা ও গৌরব দান করিয়াছেন। ইহা কবির নিজস্ব দান। অন্তরের গভীর প্রেরণার দ্বারা কবি শ্রীকৃষ্ণকে এই নূতন পটভূমিকায় দর্শন করিয়াছেন। মূল কাহিনী ভাগবতের, কিন্তু স্বকীয় কল্পনা এবং স্বকীয় চিন্তাধারার মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন ঠিক তেমনটিই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন।

কর্ম্মই যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে পারে এবং কর্ম্মগুণেই যে মানব দেবত্ব বা পশুত্বের অধিকারী হয় তাহা কবি বিশ্বাস করেন। গীতার কর্ম্মযোগকে কবি তাই অভিনব ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন প্রভাসে। কবি বলিতেছেন—

"কর কর্ম্ম, এই গতি কর অনুসার—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর ;
কর কর্ম্ম, এই গতি প্রতিকূলে আর—
পশুত্ব-জড়ত্ব—পাবে জন্মান্তর।"

মানব নিজ কর্ম্মফলের দ্বারা আপনার ভাগ্যকে গড়ে—যাহার যেমন কর্ম্ম তাহার ভাগ্যও তদ্রূপ।

"কেন প্রতিকূল কর্ম্ম করি, আমি নর ?
চৈতন্যের বিম্ব আমি ! আমি ইচ্ছাময়।
চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর
এ ইচ্ছার স্বাধীনত্বে জ্ঞান ধনঞ্জয়।"

অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন ইচ্ছাময় হরি কি মানবের এই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া তাহার কর্ম্মফল মোচন করিতে পারেন না? ব্যাস তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

"পারেন—পতিত যদি আত্মসমর্পণ
করে পাদপদ্মে তাঁর, পাণ্ডব যেমন।"

ইহা ভক্তিযোগের কথা—প্রেম মাধুর্য্যের কথা।

খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের অধঃপতনের মূলে যে জাতীয় অনৈক্য ও বহুধা বিভক্ত বিভেদ ও বৈষম্য রহিয়াছে তাহা দূর করিতে না পারিলে যে জাতীয়-জীবনের উন্নতি নাই, জাতীয়-জীবনের গৌরবময় বিকাশ যে সম্ভব নয়, তাহা কবি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। তাই তিনি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাদর্শ মানব-রূপে অঙ্কিত করিয়া এক মহা ঐক্য ও সাম্যের বাণী প্রচার করি[illegible] চাহিয়াছেন। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যে ঐক্য ও সাম্যের জন্য ভারতব্যাপী প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার ইঙ্গিত নবীনচন্দ্র তাঁহার রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রে করিয়া গিয়াছেন। কতকটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতই ইহা বোধ হয়।

রৈবতকের সপ্তদশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"গৃহভেদ, জাতিভেদ রাজ্যভেদ, ধর্ম্মভেদ
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি করিবে নিশ্চয়

ভস্ম এই আর্য্যজাতি। চাহি আমি বক্ষ পাতি

নিবাইতে-সে বিপ্লব। বাসনা আমার

চিরশান্তি, নহে সখে! সমর দুর্ব্বার।"

সেই শ্রীকৃষ্ণের বাল্য স্বপ্ন—

"—এক জাতি মানব সকল;

এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম;

একই ব্রাহ্মণ তাঁর—মানব হৃদয়

একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম্ম সাধন;

যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মানবগীতা নবীনচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে তাহারই পূর্ণ প্রকাশের চেষ্টা চলিয়াছে। নবীনচন্দ্র ভাবুক কবি—ভাবদৃষ্টিতে এবং কল্পনানেত্রে তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন হৃদয়ের আবেগে অফুরন্ত উচ্ছ্বাসের সহিত তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। হয়ত কাব্য-শিল্পের হানি ঘটিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু Art for Arts' sake এ তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"—সেই সত্য যা রচিবে তুমি।"

কবির মনোভূমিতে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহাই সত্য সুন্দর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাব্য-শিল্প, রচনাকৌশল কোন কিছুই তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। কাব্যশিল্পের প্রতি অতিরিক্ত প্রখর দৃষ্টি থাকিলে নবীনচন্দ্র হয়ত এত বড় মহাকাব্য রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। কাব্য-শিল্পই তাঁহার কাছে সব কিছু নয়, অনুভূতি এবং প্রেরণা তাঁহার কাব্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে।

চরিত্রচিত্রণে নবীনচন্দ্র সুদক্ষ শিল্পী। শৈলজা, সুভদ্রা, সুলোচনা, জরৎকারু প্রভৃতি নারীচরিত্রকে তিনি যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন

এবং দুর্ব্বাসার যে রূপ তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমধিক কৃতিত্বই দেখা যায়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা কালে নবীনচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"কুরুক্ষেত্রের চরিত্র-সম্পত্তি অতি মনোহারিণী। কি বৈচিত্র্য, কি বিশেষত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কি প্রকৃতি, কি স্বাভাবিকতা সকল গুণেই সেই সকল চরিত্র উৎকৃষ্ট। নাটককারের স্পৃহণীয় চরিত্র চিত্রণের ক্ষমতা কবিতে বিশেষ লক্ষ্য হয়।" রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস তিনখানি কাব্য-গ্রন্থেই চরিত্র-চিত্রণ নাটকীয়গুণে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাভাবিকতার সংস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারীচরিত্রগুলিও দোষে গুণে বাঙালী রমণীর আদর্শেই গঠিত বলিয়া মনে হয়। নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্বন্ধে কবি সুভদ্রার মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন—

"তদধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা-ছায়া
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ?
যেমতি অনল জল স্বজিলেন নারায়ণ
স্বজি সেইরূপ, দিদি! রোগ, শোক, দুঃখ
স্বজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক।
আছে আর কিবা সুখ, হায়, এইরূপে যদি
ঢালিয়া অমৃত মৃতে শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়।

কবি সুভদ্রার চরিত্রের মধ্যে নারী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে তিন শ্রেণীর নারীকে দেখিতে পাই। মাতা, সখী ও ভগিনী এই তিন মূর্ত্তিতে তাঁহার নারী

চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রার মধ্যে এই মাতৃস্নেহই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব সংসারে সকলেই সুভদ্রার নিকট অভিমন্যু ও উত্তরা—মাতৃস্নেহে তাহার বক্ষ পরিপূর্ণ ও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—

"………কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার ;
মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার !"

প্রেম ধর্ম্মে সুভদ্রার চরিত্র উজ্জ্বল ও কমনীয়। প্রেম ধর্ম্মের যথাযথ ব্যাখ্যাও কবি সুভদ্রার মুখ হইতেই আমাদের শুনাইয়াছেন—

"যেই জন পুণ্যবান্, কে-না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কি বা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে
সেইজন প্রেম অবতার।"

* * * *

"মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার !
শত্রু-মিত্র-তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেইজন দেবতা আমার।"

অথবা—"…এক ভগবান্ সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয় !
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা ?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?"

নবীনচন্দ্র প্রেমধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন কোন কোন সমালোচক বলেন তাঁহার মধ্যে খৃষ্টের প্রভাবই সমধিক। কিন্তু

আমরা বলি অজ্ঞান মানব জাতির জন্য যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল সেই প্রেমাবতার নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনেও তো এই প্রেম-ধর্ম্মই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দোষ হইতেছে যাহা কিছু ভাল দেখি তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব টানিয়া আনা। প্রাচ্যের মাটিতে যে কত অমূল্য মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না।

নবীনচন্দ্রের শৈলজা চরিত্র এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শৈলজার ন্যায় চরিত্র বাংলা সাহিত্য কেন বিশ্ব সাহিত্যেও বড় বেশী মিলে না। যে অনার্য্য কন্যা শৈলজা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অর্জ্জুনকে দংশন করিতে উদ্যতা হইয়াছিল, কবি কৌশলে তাহার চরিত্রকে কেমন ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আনিয়া স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে পতিভাবে পাইবার বাসনা যাহার মধ্যে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল অর্জ্জুনকে না পাওয়ায় প্রতিহিংসার কোন ছায়া তাহার মধ্যে দেখা দিল না। যোগিনীবেশে দুশ্চর তপস্যায় সে আত্মনিমগ্ন হইল। ধীরে ধীরে আত্ম-যোগের মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়ভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল—অর্জ্জুনের প্রতি পতিভাবযুক্ত দৈহিক কামনা ঘুচিয়া গিয়া পিতৃভাব ফুটিয়া উঠিল, অপার্থিব শান্তিতে তাহার হৃদয় মন ভরিয়া উঠিল—

"ঈর্ষার নরক নিভিল হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল।
মেলিনু নয়ন— বেলা অবসান
শান্তিপূর্ণ ধরাতল।"

শৈলজার চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন—"সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সুভদ্রা ও শৈলজা কেবল আর্য্য অনার্য্য

রমণীমাত্র নহে, কিন্তু আর্য্য ও অনার্য্য শক্তির প্রতিরূপ। যমুনা ও জাহ্নবী যেমন প্রয়াগে মিলিত হইয়া পুণ্যতম তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে; সেইরূপ আর্য্য ও অনার্য্যশক্তি কৃষ্ণের পদতলে সম্মিলিত হইয়া পতিত উদ্ধার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের যে বাসনা—ভেদাভেদ বর্জ্জন করিয়া এক মহান্ ঐক্যের বন্ধনে সমগ্রজাতিকে বাঁধিয়া এক মহাজাতিতে এই খণ্ডিত ভারতকে এক করিয়া গড়িয়া তোলা—তাহার পরিচয়ও এই দুইটি নারী চরিত্রের সম্মেলনে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পতিত ভারতের উদ্ধার কল্পে যেন গঙ্গা যমুনার সম্মিলন হইয়াছে এই সুভদ্রা ও শৈলজা চরিত্রের মিলনে।"

নবীনচন্দ্রের কাব্যে শিল্পগত দোষ-ত্রুটি অনেক কিছুই অনেক সমালোচক দর্শাইয়াছেন। কিন্তু সে সকল সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর উঁচুদরের কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে তাহার কাব্যে মহাকাব্যের লক্ষণ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন লিরিক্ গুণের প্রাধান্যই তাঁহার কাব্যে সমধিক দেখা যায়। হয়ত নিখুঁত কাব্য বিচারের দিক্ দিয়া এ সকল কথা সত্য, কিন্তু যে হৃদয়াবেগ ও প্রাণস্পন্দনের সাড়া তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায় তাহাও এক দুর্লভ সামগ্রী। মনীষী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁহার Neo-Romantic Movement in Literature প্রবন্ধে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলিয়াছেন—"Babu Nabin Chandra Sen's Raivataka is the epic of the Hindu religious revival. This huge epic, in twenty books, is marred by an apathetic incongruity that is repulsive and fatal." কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন—"It is difficult to repress one's admiration for the creative genius that could conceive the three striking figures—Krishna, Vyasa and Arjuna."

কবির কবিমানস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উভয়ই অদ্ভুত ভাবে তাঁহার জীবনাদর্শ ও কাব্যাদর্শের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি গীতার এই তিনটি ধারা নবীনচন্দ্রকে নূতন সুর, নূতন ভাবদ্যোতনা যোগাইয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবল বন্যায় কবির হৃদয় ভাসিয়া যায় নাই। হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শকে নবরূপ দান করিয়া কবি স্বাজাত্যপ্রীতি ও স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় যেমন এদিকে দিয়াছেন, তেমনি পৌরাণিক বিগ্রহমূর্তির পাষাণদেবতার পূজাও তিনি করেন নাই। সেই পাষাণমূর্তির ভিতর তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া সচল যুগের মাহাত্ম্যকেই প্রচার করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যে যে ধাত্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্যই তিনি সাহিত্য জগতে অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রতিভা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল, পর্ব্বতের ন্যায় সু-উচ্চ—আকাশের মত স্বাধীন—সত্য ও কল্পনার পাখা মেলিয়া তিনি নভশ্চারী হইয়াও ধরণীর শ্যাম-শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া চিরশান্তির পথের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন—ভ্রাতৃত্বের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইলে ধরণী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সর্ব্ব অশান্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কবে সে দিন আসিবে কে জানে?

নবীনচন্দ্র ও "পলাশির যুদ্ধ"—

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী, বি-এ

"The poem now before us is from the pen of one who needs no introduction to the Bengali reading public. The readers of the "Banga Darsan" will recognise in him the author of those charming little pieces, which have so often 'taken their prison souls captive and lapped them in Elysium.' The energy of his lines has already ranked him as the Byron of the East" (M. O. C. Dutt in the 'Hindu Patriot').

আলোচ্য বিষয় কবি নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'। তাই সমসাময়িক সমালোচকের চোখে কবি নবীনচন্দ্রের স্থান ছিল কোথায় —সেটা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। প্রাগ্-রবীন্দ্রযুগে নবীনচন্দ্রের কাব্য বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছিল এবং তারই প্রতিধ্বনি আমরা পাই উপরি-উদ্ধৃত সমালোচকের সমালোচনায়। 'পলাশির যুদ্ধ' বাঙালীর অবরুদ্ধ মনোবেদনাকে, শৃঙ্খলের গ্লানিকে প্রকাশের পথ দিয়েছিল—বাঙ্গালী সেদিন খুঁজে পেয়েছিল তারই চিন্তার ও ভাবধারার অনুরণন 'পলাশির যুদ্ধের' প্রতিটী ছত্রে। যে নবীনচন্দ্র বাঙালীর মনোবিহঙ্গকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন—দিয়েছিলেন তাকে অসীম নভোমণ্ডলে বিচরণের স্বাধীনতা—সেই মহাকবির অমর লেখনী রচনা করল নূতন আদর্শে 'নবতর কাব্যগ্রন্থ'। 'পলাশির যুদ্ধের' চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়—তারা ঐতিহাসিক সত্য। পলাশির প্রান্তরে যে অগ্ন্যুদ্গার হয়েছিল, তারই উষ্ণ 'লাভা'স্রোত নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। রাণীভবানীর ও মোহনলালের চরিত্রচিত্রণ আমাদের মনের উপর দাগ রেখে যায়। মোহনলালের সেই স্বগতোক্তি—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।

তুমি অস্তাচলে দেব ! করিলে গমন

আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদরজনী ।" —আজো

আমাদের মনে পড়ে যায়, যখন দেখি অস্ত-শিখরে ক্লান্ত সূর্য সমারূঢ়। বাঙলার সেদিনের জনপ্রিয় কবি নবীনচন্দ্র বাঙলা ও বাঙ্গালীকে যা' দিয়েছিলেন, তা' কালের কুক্ষিতে স্বীয় স্থায়ী আসন লাভ করেছে — সেখানেই কবির সার্থকতা। মহাকবি মাইকেল ও হেমচন্দ্র, সে যুগের বিশিষ্ট কবি-প্রতিভা ছিলেন সত্য, তবু জনপ্রিয় ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র। মহাকবি মাইকেলকে বাঙালী সেদিন বোঝেনি আর মহাকবি হেমচন্দ্র বাঙালীর মনের কথাকে এমন সুন্দরভাবে রূপায়িত করেননি—তাই নবীনচন্দ্র সে যুগে বাঙালীর হৃদয়ে পেয়েছিলেন অমর আসন। 'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে'—সেদিনের নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে বলা চলে।

"মনুষ্য-জগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্বাংশে নিখুঁত নহে।"—[শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ—বান্ধব] আমরা সমালোচকের সহিত একমত। নিখুঁত কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়নি 'পলাশির যুদ্ধে'—একথা আমরা স্বীকার করি। তবু বলি 'পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে।' মহাকবি নবীনচন্দ্রের অতুল কাব্য-প্রতিভার অম্লান-কুসুম নিখুঁত হয়নি সত্য, তবু তার মাঝে আমরা পেয়েছি সত্যিকারের কবিমনের পরিচয়। উলঙ্গ কবি-দৃষ্টি বারবার ছুঁয়ে গেছে সেদিনের বাঙালীর হৃদয়ের অন্তস্তলকে, তাই তাঁর কাব্যে সেদিনের বাঙালী মনের কথাটী বারবার ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। চরিত্রচিত্রণে হয়ত' কবি দক্ষহস্ত ছিলেন না, হয়ত' বায়রণের মত বজ্র উদ্দামতা তাঁর লেখায় ও কল্পনায় সর্বত্র ফুটে ওঠেনি, হয়ত' মাইকেল-প্রতিভার বহুমুখীনতা ও হেমচন্দ্রের বিরাট ছন্দ-গাম্ভীর্য

তাঁর লেখায় ছিল না—তবু বলব, নবীনচন্দ্র ছিলেন সেযুগের লোকপ্রিয় কবি—যাঁর গলে সেদিনের বাঙ্গালী পাঠকের দল দিয়েছিল তাদের বরমাল্য। সেদিনের বাঙ্গালী পাঠক সম্যকরূপে চেনেনি তাদের প্রিয় কবিকে, তবু তাকে হৃদয়ের স্বর্ণাসনে স্থান দিয়েছিল। আমরা আজ দূর থেকে এই মহাকবিকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। দূরত্ব মহাকবিকে আরো বড় করে তুলেছে আমাদের চোখে—

'অস্তি সন্তং ন জহাতি, অস্তি সন্তং ন পশ্যতি।'

পলাশির যুদ্ধে মাঝে মাঝে আমরা পাই অনুকৃতির আভাস। কবি নবীনচন্দ্র হয়ত' জানতেন না যে তাঁর লেখনীপ্রসূত 'তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল' মহাকবি ভারবির "ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ।"—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকার্দ্ধের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌছাবে। হয়ত' এটা ইচ্ছাকৃত, হয়ত' বা আকস্মিক। এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলেনা। তবে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন—এ কথা সত্য। দ্বিতীয় সর্গে কবি 'আশার' যে বন্দনা গান করেছেন (ধন্য আশা কুহকিনি। তোমার মায়ায়……) তর সাথে আমরা মিল খুঁজে পাই স্কট কবি ক্যাম্বেলের 'আশা' শীর্ষক কবিতার; তৃতীয় সর্গে বর্ণিত সিরাজের স্বপ্নদর্শনের সাথে মহাকবি সেক্সপীয়রের "তৃতীয় রিচার্ডে" বর্ণিত স্বপ্নদর্শনের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে—একথা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। বায়রণ ও স্কটের প্রভাব নবীনবাবুর কাব্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় সর্গে বৃটিশ সৈনিকদের গান (চিরস্বাধীনতা অনন্ত সাগরে) আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বায়রণের সেই নাবিক দস্যুদের অমর সংগীত। তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে সিরাজের শিবিরে যখন চলেছে নৃত্যগীতের উদ্দামলীলা, এমন সময়ে বৃটিশের কামান গর্জন আমরা শুনতে পাই। আমাদের তখনই মনে পড়ে যায় কবি বায়রণের

ওয়াটার্লু যুদ্ধের পূর্ব রাত্রির বর্ণনা "There was a sound of revelry by night" &c.

বায়রণের প্রভাব নবীনচন্দ্রের লেখনি এড়াতে পারেনি, তার কারণ তাঁর উদ্দাম ছন্দ বায়রণ-সৃষ্ট পথকেই আপনার গতিপথ ব'লে মেনে নিয়েছিল। সেজন্য 'পলাশির যুদ্ধের' সমালোচনার প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—"যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি বা না পারি, তাঁহাকে বাঙ্‌লার বায়রণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।" সত্য সত্যই নবীনবাবু ছিলেন বাঙ্‌লার বায়রণ। "ইংরেজীতে বায়রণের কবিতা তীব্র, তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাবসকল আগ্নেয়গিরি-নিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ যখন ছুটে তখন তাহার বেগ অসহ্য। "(বঙ্কিমচন্দ্র)। নবীনবাবুর কাব্যপ্রবাহের তীব্র উচ্ছ্বাস বায়রণেরই অনুরূপ।—

"But mine was like the love flood,
That boils in Etna's breast of flame
I cannot praise in puling strain
Of lady--love and beauty's chain"..... এই ছত্র কয়েকটী কবি বায়রণ ও নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। কবি নবীনচন্দ্রকে আমরা অনুকৃতি দোষে দুষ্ট বলে মনে করি না। বাল্মীকি বা হোমরের "পরকীয় পদানুসরণ" করতে হয়নি, কারণ তাঁরা ছিলেন আদি কবি। যাঁরা এসেছেন পরে, যাঁরা উত্তর সাধক, তাঁদের 'পরে পূর্বগামীদের ছাপ পড়বেই। দার্শনিকের ভাষায় বলি—"We are to suck at the breast of the Universal Ethos." যারা অপরের ঋণ গ্রহণ করেনা তারা "either a beast or a god." সুতরাং আমরা নবীনচন্দ্রের কাব্যের 'পরে সাগরপারের সাহিত্যের এই ছায়াপাতকে খুব দোষের ব'লে মনে করিনা। আমরা মনে করি,

ইংরেজী সাহিত্যের সাথে Walter Scot এর 'Lady of the Lake' এর যে সম্বন্ধ, বাঙ্‌লা সাহিত্যের সাথে 'পলাশির যুদ্ধের'ও ঠিক সেই সম্বন্ধ। "ইহা (পলাশির যুদ্ধ) নিশ্চয়ই বাঙ্‌লাভাষার কণ্ঠহারে একটী কমনীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে এবং যতদিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিনই ইহার প্রফুল্ল কান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।"—(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)।

এইবার কাব্যপ্রবেশের পালা। পাঁচটি সর্গে 'পলাশির যুদ্ধ' বাঙালীর অশ্রুতে সজল ও শত মোহনলালের বুকের রক্তে রঙীন!

"এই কি' পলাশির ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গন?

এইখানে কি বলিব? বলিব কেমনে!" —আমাদের মনে তোলে তীব্র আলোড়ন। আমরা প্রত্যক্ষ করি মানসনেত্রের সুতীব্র-জ্যোতিতে আমাদের 'পলাশিক্ষেত্র'; প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনভূমি এই পলাশির প্রান্তরে 'মোগলের মুকুট রতন খসিয়া পড়িল আহা'! নবীনচন্দ্র ছিলেন হৃদয়ের কবি। তাই তাঁর ছন্দের ঝঙ্কার স্পর্শ করে হৃদয়-মনকে, দুলিয়ে দেয় আমাদের সমস্ত সত্তাকে। পোপের মত তিনি বুদ্ধির কবি ছিলেন না। তাই তাঁর কাব্যে দেখি ভাবালুতার সমারোহ। তাঁর কাব্যস্রোত ব'য়ে চলে, আর তার স্বচ্ছ মুকুরে ফুটে ওঠে কত শত ছবি—

"দিবা অবসানপ্রায় নিদাঘ ভাস্কর
বরষি অনলরাশি সহস্র কিরণ
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে শ্রান্ত কলেবর
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন"—। কবিকল্পনা উদ্দাম হ'য়ে ওঠে ঘটনার সংঘাতে আর কাব্যস্রোতের ফেনিল আবর্তে রচিত হয় সুশুভ্র ফেনমালা। কবির ভিতরে যে দার্শনিক বাস করে, তারো দেখা আমরা পাই স্থানে স্থানে—

"ভবিষ্যৎ অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল-আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ—"।

এখানে দার্শনিক নবীনচন্দ্র আমাদের বুদ্ধির দুয়ারে হানা দেয়। আমরা মানুষের পরিণতি (Bosanquet এর ভাষায় Destiny) সম্বন্ধে চিন্তা করি। কবির লেখনী যে কাব্যে সৃষ্টি করেছে তা "half lyric" এবং "half narrative"। কবি ক্লাইবের চিত্র এঁকেছেন—

নীরবে ক্লাইব মগ্ন গভীর চিন্তায়।
গম্ভীর মুখশ্রী কিন্তু বদন মণ্ডলে
নাহি স্বরূপের চিহ্ন; মনোহারিতায়
নাহি রঙ্গে শ্বেতকান্তি; অথচ যুবার
সর্বাঙ্গ সৌন্দর্যময়……।"

এই চিত্র যেমন সুন্দর তেমনি সম্পূর্ণ। চিত্রণে নবীনচন্দ্র যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর কাব্যের সর্বত্র। গীতি-কবিতার সুর 'পলাশির যুদ্ধে' বহুবার ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—

"যেন বালার্ক কিরণে
কনক অলকাবলী, বিমুক্ত কুঞ্চিত
অপূর্ব খচিত চারু কুসুম রতনে—
চির বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত।"

আমাদের কাণে আজো বাজে নবীনচন্দ্রের সাবলীল ছন্দের নূপুর নিক্কণ। তাঁর ছন্দোলালিত্য ও পদবিন্যাস আমাদের মনকে মুগ্ধ করে—আমরা কবির সাথে তাঁর তৃতীয় কাব্যলোকে ভ্রমণ করি। কখনো শুনি বীর মোহনলালের বজ্রধ্বনি—"

দাঁড়ারে! দাঁড়ারে ফিরে! দাঁড়ারে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয় গণ!

আমাদের মন যুগপৎ আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হয়। ভাবি, হয়ত' ভারতের ভাগ্যাকাশে আবার নবসূর্যের উদয় সম্ভব হ'বে। মোহনলালের মুখনিঃসৃত গৈরিক 'লাভা'স্রোত আমাদের মনকে স্পর্শ করে, হৃদয়কে ক'রে তোলে অগ্নিগর্ভ বিসুবিয়স। আবার নিভে যাই যখন দেখি—

"মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর
শোণিত আরক্ত কায়
অস্ত গেল রবি হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব ভাস্কর।"

আমাদের মনের মিনারে অস্তসূর্যের শেষ রশ্মি ঘোষণা করে জাতির অন্তিমকাল। সভয়-বিস্ময়ে আমরা দেখি পলাশির প্রান্তরে শেষ সূর্যাস্ত। কালো আঁধারের গর্ভে জেগে থাকে মোহনলালের ছবি— শুনি তার সেই দূরাগত কণ্ঠের ধ্বনি—

"সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়
ভারত অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়;
কখন হইবে কিনা জানে ভবিষ্যত।"

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সেই সাধনা চলেছে, যে সাধনা 'এই রবিকে' চির অস্তমিত করতে পারে। আজকার দিনে ভারতের বুকে জেগেছে নতুন মোহনলালের দল। মীরজাফর আজ পলাতক— উমিচাঁদের সহচরেরা আজ প্রত্যন্তবাসী। এই জাতীয় জাগরণের দিনে আমরা স্মরণ করি মোহনলালকে, স্মরণ করি নবীনচন্দ্রকে আর মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে সুর মিলিয়ে বলি— "যে বাঙালি হইয়া বাঙালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙালি জন্ম বৃথা"।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও মহাকবি নবীনচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ

বাংলার উনবিংশ শতাব্দী জাগরণের যুগ। বাংলার রাজনীতি সমাজনীতি বিশেষ করিয়া বাংলার সাহিত্য ও ধর্ম্ম এযুগে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। এ জাগরণ ক্লান্ত অবসন্ন দেহমনে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠার মত। বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মে তখনও অবসাদের চিহ্ন। শতাব্দী ধরিয়া আকণ্ঠ সুধাপানে তৃপ্ত তাহার আত্মা দীর্ঘকাল একপ্রকার আচ্ছন্ন ছিলই বলিতে পারি। সে ভাব কটিতে সুরু হয় এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। যুগপ্রয়োজনই তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, স্বভাবধর্ম্মে এই জাগরণ আপন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাইতে। বাঙ্গালী জীবনের বহুমুখী ভাবধারার বিকাশপথে ইউরোপীয় সভ্যতা কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিগণের জীবন আলোচনায় এই সত্যই বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। বাংলা সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীতে; প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার বৈষ্ণবসমাজ যে সাহিত্য-রসচক্র গড়িয়া তুলিয়াছিল সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। ভগবানকে অন্তরতম প্রিয়রূপে লাভ করিবার আকুল আগ্রহে আত্মনিবেদনের এই কাহিনী বাঙ্গালী কোন কালেই বিস্মৃত হইবে না। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী এই সাহিত্যের বহুবিচিত্র রসধারা নানারূপে পর্য্যাপ্তি লাভ করতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়—এবং পলাশীর যুদ্ধের পর সে ক্ষীণ রেখাও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম ঘটে। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আত্মরক্ষার স্বভাবধর্ম্মে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সে সঙ্কুচিত সাংস্কৃতিক রূপ উনবিংশ শতাব্দীতে নব ভাবে উদ্বোধিত হয়। এই উদ্বোধন রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত

আপন আপন সাধনায় মহা ঐশ্বর্য্য রূপে এইযুগকে স্মরণীয় করিয়া তোলে। বাংলা সাহিত্যের নবযুগের আবির্ভাবে কবি বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, আপন আপন সৃষ্টিপ্রেরণায় যখন বিভোর—, তখন নবীনচন্দ্র তাঁহার অলৌকিক সৃষ্টিপ্রতিভায় নবযুগের জয়যাত্রার অর্ঘ্য সাজাইতে আরম্ভ করেন। পার্ব্বত্য কঠোর রূপে সম্মিলিত কুসুমকোমলতা তাঁহার অনমনীয় পৌরুষধর্ম্মে এমন মহত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা তাৎকালিক কোন কবির জীবনে ছিলনা।

জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীনচন্দ্র এক অখণ্ড সত্তায় দেখিতেন। একটী উজ্জ্বল প্রাণধর্ম্মের তিনটী প্রবাহরূপে মানব ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য্য। জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র একক রূপ তাঁহাকে বিশেষভাবেই পীড়িত করিত। জীবন ও কাব্যকে তিনি অভিন্ন দেখিতেন। তাঁহার কাছে জীবনের আন্তর রূপই ছিল কাব্য। বিশ্বজনীন ভাবরূপে পরিব্যক্ত হইয়া বিশ্বাতীত আনন্দরূপেই ইহার শেষ পরিণতি।

আত্মবিভেদের দুঃসহ গ্লানিভারে নিপীড়িত জাতীয় আত্মা। অসহায় একক আমরা এক হইতে না পারিলে কিছুতেই মুক্তির সন্ধান লাভ করিতে পারিব না। চলার পথ সহস্র অঙ্কুশে আচ্ছন্ন থাকিয়া জীবনের গতি থামাইয়া দিবে। জীবনের কোন ধারাই সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। কবি প্রথমেই জীবনকে সর্ব্ববিধ জড়তা হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভারতবর্ষের অতীত সংস্কৃতিকে আমরা বর্ত্তমানে যেরূপে লাভ করিবার অভিলাষী মহাকবি নবীনচন্দ্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেই তাহার ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার অনন্যসুলভ কবিধর্ম্ম ও জীবন-দর্শনের নিবিড়তায় এই সত্যটী বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া উদার ভ্রাতৃবন্ধনে সমগ্র দেশবাসীকে এক করিতে না

পারিলে জাতীয় আত্মা তাহার অবাধ গতি লাভ করিতে পারিবে না। তাই তিনি ভারতের জাতীয় আত্মা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলাধার প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মহাকাব্যের মূল নায়ক করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর নব জীবনবেদ রচনা করিলেন। এই জীবনবেদিকার পুণ্যপাদপীঠে সুশীতল ছায়ালোকে চল্লিশকোটী মানবের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান ঘটিতে পারে। এই মুক্তিপথে কোন বন্ধনকে তিনি স্বীকার করেন নাই—মানবত্ব ভিন্ন কোন ধর্মকে স্থান দেন নাই; পুরুষের সত্যধর্ম ও নারীর সেবাব্রতকে মহামানবতার মিলনরূপে এক করিয়া যে আদর্শরূপ তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান যুগসভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতর দিয়া তাঁহার কবিধর্ম্মের সম্যক্ পরিস্ফুরণ ঘটিলেও শিল্পচেতনা হইতে তিনি ভ্রষ্ট হন নাই—প্রাণসত্তার উপজীব্য যে পৌরুষ রূপ, তাহাকে সংযমনিষ্ঠায় গৌরবোন্নত করিয়া শিল্পসুষমায় মধুর করিতে তিনি কখনো ভুলেন নাই। দ্রষ্টা কবি জাতীয় জীবনের তথা সাহিত্য ও ধর্ম্মজীবনের মহা সমন্বয়ে ভারতবর্ষকে এক মহাজাতির আবাসভূমিরূপে অবলোকন করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাবদৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্—যাহা লইয়া উত্তরযুগ আপন পথে চলিতে সক্ষম হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর কোন সাহিত্যই জাতিকে সত্য সন্ধানে শক্তি ও সাহস জোগাইতে পারে নাই। কান্ত কোমল পদাবলী অথবা নয়নমনোলোভন চরিত্ররূপ মুহূর্ত্তমাত্র আনন্দের সৃষ্টি করিলেও পরম শ্রেয়োলাভের কোনো সহায়ক হইতে পারে নাই। সাহিত্যে থাকিবে সত্যিকারের জীবনের রূপ এবং রূপে রসে সমৃদ্ধ সাহিত্য যেমন জাতিগঠন ও সমাজনিয়ন্ত্রণ করিবে তেমনি জীবনের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের সন্ধানও তাহাকে জোগাইতে হইবে, তবেই তাহার পরম সার্থকতা।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কাব্যে সর্ব্ববিধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয় থাকিলেও জাতীয় জীবনের সর্ব্ব অনর্থ বিলোপে সত্যপন্থা উদ্ভাবনের কোন আদর্শ রূপ তাহাতে নাই। জীবনের চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে এই কাব্য তেমন কোন শান্তিপূর্ণ বাণী শুনাইতে অথবা বৃহত্তর কোন জীবনাদর্শের রূপ দেখাইতে পারিবে না যাহাতে সঙ্কট-বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করিয়া জাতি পরম শ্রেয় লাভ করিতে পারে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের সর্ব্ব ধর্ম্মের এই মহান অভাব মহাকবি নবীনচন্দ্র তাঁহার জীবন সাধনার মহা-আদর্শরূপ মহাকাব্যত্রয়ে পরিপূরণ করিয়া জাতীয় জীবনের যে মঙ্গলসাধন করিয়াছেন তাহা জাতি কখনো ভুলিবে না।*

নবীনচন্দ্র

শ্রীসুবোধ রায়

বাংলার কাব্যগগন যখন সম্পূর্ণ তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, তখন সেই প্রদোষান্ধকারে যাঁহাদের কবি-কাকলি আশা-উজ্জল উষাগমের আনন্দ-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল, নবীনচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে (হেমচন্দ্র ও রঙ্গলাল) শুধুই অন্যতম নহেন, বিশিষ্টতম—সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয় ও স্মরণীয় কবি। বর্ত্তমান যুগের গীতি-কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের দান-সমৃদ্ধ কাব্য-জগতে বাস করিয়া বাংলা গীতি-কাব্যের যে অমোঘ ও নির্ম্মল প্রাণবায়ু অলক্ষিতে অহরহ আমাদের হৃদয় মনকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে বাংলাদেশে একদিন তাহা সুলভ ছিল না। বাংলার বাণী-পীঠ-তলে নবীনচন্দ্রের কাব্যার্ঘ্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, সে যুগের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ

*চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মহাকবি নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকীতে পরিষদ সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মান নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন।

"একদিন আচম্বিতে আমরা দেখিলাম যে পাশ্চাত্য তাহার নূতন শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ লইয়া আমাদের কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে বলীয়ান্ পাশ্চাত্যের সহিত সংঘর্ষে আমাদের প্রাচীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শগুলি জরাজীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। সেই ভগ্নস্তূপের দিকে চাহিয়া মন হতাশায় ভরিয়া উঠে। যাহা গিয়াছে তাহার জন্য নয়নে অশ্রু, কিন্তু সেই সঙ্গে নূতনকে পাইবার জন্য অন্তরে আকূতি। পুরাতন ধূসর ও ঊষর বহির্জগত হইতে অন্তরের তৃষ্ণা আর মিটে না। তখন মন কল্প-জগতে আশ্রয় লয়, বাস্তব জগতের অর্থহীন নিয়মের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া মনোমত ভাবজগতের সৃষ্টি করে। শুধু এ দেশে নয়, এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে সর্বদেশে ও সর্বকালে রোম্যান্টিক কাব্যের সূচনা। নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই সূচনার লক্ষণ একান্তভাবে সুপরিস্ফুট। হৃত-আশ্রয় অথচ নবসৃষ্টি-সন্ধানী মনের কান্নাহাসি বিজড়িত অস্পষ্ট আকূতি ও কল্পনা-বিলাস রোম্যান্টিক্ যুগের প্রথম প্রচেষ্টার এই লক্ষণ নবীনচন্দ্রের প্রথম কবিতা গ্রন্থ "অবকাশরঞ্জিনী"তে সুস্পষ্ট। ভাব তখনও আপনার ভাষা খুঁজিয়া পায় নাই, কল্পনা (Imagination) তখনও নিরালম্ব, তখন তাহা খেয়ালেরই (Fancy) অন্তর্গত। তাহাতে সহজ স্বাভাবিক প্রকাশের চেয়ে কৃত্রিমতার ভাগই সমধিক। তাই মনীষী ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:—"This Lyric craze, this **"sturn and drang"**, was, however, more a play of the fancy than of the imagination, more artificial than artistic......Avakas-Ranjini may be regarded as typical of this ephemeral class of poem." (New Essays in Criticism. P. 48)

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার গীতিকাব্যের সূচনাকর্ত্তা নবীনচন্দ্রের এই অপরিণত প্রারম্ভ অতি সত্বরই কিন্তু পরিণতি ও শক্তির পরিচয় বহন করিয়া আনে। "অবকাশরঞ্জিনী" প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে আর "পলাশীর যুদ্ধ" ১৮৭৫। কিন্তু এই দুটি কাব্য গ্রন্থে আকাশ পাতাল তফাৎ। "পলাশীর যুদ্ধের" কবি আর সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবোদ্বেল উচ্ছ্বাসময় ব্যষ্টিমাত্র নহেন, সমগ্র জাতির আশা-নিরাশা, ভাবনা বেদনা, হাসি অশ্রু তখন তাঁহার বাণীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাব আপনার ভাষা, কল্পনা আপনার আশ্রয়, সঙ্গীত আপনার স্বরগ্রাম খুঁজিয়া পাইয়াছে।

অবশ্য ইহার বীজ অপরিণত অবস্থায় "অবকাশরঞ্জিনীর কবিতাগুলির মধ্যেই লুকায়িত ছিল। এই পুস্তকের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবির নিজের কথাই উদ্ধৃত করা ভাল :—

"অবকাশরঞ্জিনীর" প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই আমার আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত।........."অবকাশরঞ্জিনীর" সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ, আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" ও "ব্রজাঙ্গনা"য় খণ্ড কবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, স্মরণ হয়, আমার 'এডুকেশনে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র প্রদর্শক "প্রভাকর।" তবে "প্রভাকর"ও কাব্যাকারে প্রকাশ হয় নাই। হেমবাবু, স্মরণ হয় তখনও খণ্ড কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। আমি 'প্রভাকরে'র অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, "অবকাশ রঞ্জিনী" বোধ হয় বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য।

দ্বিতীয়তঃ, আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্ব্বে স্মরণ হয়, স্বদেশ-প্রেমের নাম গন্ধ বাংলা কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর "ভারত সঙ্গীত" আমার স্বদেশ প্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়। এই নূতন সুর এমন একটি উচ্ছ্বাস স্কুলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছিল যে, যশোহরের বন্ধুরা আমার কোনও কোনও কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা আওড়াইতেন।" ("আমার জীবন"—দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১৭৮-৭৯)

অতএব "অবকাশরঞ্জিনী" হইতে "পলাশীর যুদ্ধ"—কবি মানসের ক্রম পরিণতির একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বহন করে। "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও ইহার সূচনা কিন্তু ইহার সাত বৎসর আগে ১৮৬৮ সালে। এই অপূর্ব্ব কাব্যখানির আরম্ভ কিন্তু অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। যশোহরে "সাহিত্য সমিতির সভ্য তিনজন,—আমি, জগবন্ধু ভদ্র ও মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। জগবন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং মাধব তখন উকীল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বহি লিখিব। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর-বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্ব্বদা মনে পড়িত এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্ব্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিব। এরূপে কি কার্য্যের অঙ্কুর শ্রীভগবান কোথায় আমাদের অজ্ঞাতভাবে স্থাপন করেন, তাহা তিনিই জানেন। জগবন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহীবিদ্রোহের কোনো ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল। আমার যেই কথা, সেই কাজ। আমি চিরদিনই একজন বাক্যবাগীশ। আমি তখনই 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম।" ('আমার জীবন' দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ২২২)

ইহা ১৮৬৮ সাল শরৎকালের কথা। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৩ সালে তিন মাসের ছুটী লইয়া নবীনচন্দ্র এই কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। "পলাশীর যুদ্ধ" সে সময়ে সাহিত্য জগতে কি চমকপ্রদ বিস্ময় এবং উত্তেজনাময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, "সাধারণী", "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হওয়া মাত্র নব স্থাপিত 'ন্যাশান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। সাহিত্যে ও জীবনে ইহা এক নূতন আলোড়ন, নূতন চেতনার সঞ্চার করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের উদ্বোধয়িতা ও জাতীয় মন্ত্রের উদ্গাতা যে তিনজন সাহিত্যিক তাঁহারা প্রত্যেকেই—আনন্দমঠের লেখক ও "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম, 'নীলদর্পণ' রচয়িতা দীনবন্ধু ও "পলাশীর যুদ্ধের" কবি নবীনচন্দ্র—ছিলেন সরকারী চাকুরে। দুইজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও একজন পোষ্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সে যুগের সরকারী চাকুরে ও আজকালকার সরকারী চাকুরেতে প্রভেদ কত!

ইহার পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে তাঁহাকে দেখি "রৈবতক," "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাসের" কবিরূপে। এখানেও নবীনচন্দ্র দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত একাত্ম হইয়া, জাতির অন্তঃপ্রকৃতির বাণীমূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য মোহগ্রস্ত শিক্ষিত সমাজ ইংরাজের অনুকরণে ও অনুসরণে আহারে-বিহারে, আচারে ব্যবহারে, ভাবে-ভাবনায় বিজাতীয় অন্ধকূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছিল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা, বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচার" ও অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবন" একদিকে যেমন ইহার গতিরোধে সহায়তা করিয়াছিল তেমনি আর একদিকে নবীনচন্দ্রের এই তিনখানি কাব্য জাতীয় জীবনের অতীত ঐতিহ্যের এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময়

মহিমান্বিত ছবি এমন সুস্পষ্ট রেখায় ও সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে যে, দিশাহারা পথভ্রান্ত পথিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া আপনার ঘরের কথা স্মরণ করিয়া মাতৃ-অঙ্কে ফিরিয়া আসিবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। একই ঘটনাপ্রবাহ ও সুরের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে তিনখানি কাব্যকে গ্রথিত করিয়া বাংলা কাব্যে এইরূপ ত্রয়ী (Trilogy) রচনা করিবার কৃতিত্ব ও গৌরব একমাত্র নবীনচন্দ্রেরই। "রৈবতক" ও "কুরুক্ষেত্রের" মধ্যে এক অখণ্ড মহাভারত প্রতিষ্ঠার—শুধুই রাজনৈতিক সাম্রাজ্যরূপে নয়, ধর্ম্মরাজ্যরূপে—যে অপূর্ব্ব পরিকল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং এই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়করূপে শ্রীকৃষ্ণের একই সঙ্গে যে মানবীয় ও লোকোত্তর চরিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, কবিদৃষ্টির গভীরতা ও মৌলিকত্বে তাহা অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়। আর্য্য-অনার্য্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সর্ব্বজাতির মিলনভূমি এক অখণ্ড মহাভারতের স্বপ্নদর্শী এই দেশপ্রেমিক কবি মনীষীকে, অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাকামীকে, আজিকার দিনে আমরা বারে বারে প্রণাম জানাই।

নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নবীনচন্দ্র সেনের পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আসলে ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। উৎসর্গ পত্রের শেষে তারিখ পাই ১২৮২ সালের মাঘ মাসের। সুতরাং ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

পলাশির যুদ্ধের একটি সংস্করণ ঢাকায় ছাপা হইয়াছিল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। মুদ্রাকর ও প্রকাশক মণ্ডলা বক্‌স। পূর্ববঙ্গে কাব্যটির

অসাধারণ সমাদরের আরও প্রমাণ আছে। এই সালে অর্থাৎ প্রথম মুদ্রণের পর বৎসরেই—ঢাকা এবং বরিশাল হইতে পলাশির যুদ্ধ কাব্যের দুইখানি ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছিল। প্রথমখানি অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা, নাম 'পলাশির যুদ্ধের ব্যাখ্যা'। দ্বিতীয়খানির নাম 'পলাশির যুদ্ধের টীকা', লেখকের নাম রাজমোহন চক্রবর্ত্তী। এটিতে শুধু প্রথম তিন সর্গের ব্যাখ্যা ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে পলাশির যুদ্ধ একটু নূতন সুর আনিল সাহিত্যে দেশপ্রেম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পদ্মিনী' কাব্যে (১৮৫৮)। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতায় (১৮৬৯) দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এই দুই কাব্যে ও কবিতায় ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীনতা হীনতার ক্ষোভ মুসলমান শাসনের পটভূমিকায় জনান্তিকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিনিময় তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে যে ধিক্কার জাগাইতে সুরু করিয়াছিল, কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হইল নবীনচন্দ্রের লেখনীমুখে। অবশ্য পলাশির যুদ্ধের কবি প্রত্যক্ষভাবে সিরাজুদ্দৌলার সমর্থন করেন নাই। কেননা তখনও ঐ সময়ের ইতিহাস একতরফাই জানা ছিল। নানা কারণে ক্লাইবের বিপক্ষে কিছু বলাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নবীনচন্দ্র মোহনলালকে তাঁহার কাব্যের আসল 'হীরো' করিয়া দুই দিক বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজপুত ইতিবৃত্তের বকলম এড়াইয়া নবীনচন্দ্র এই যে পরাধীনতার মর্ম্মবেদনা ধ্বনিত করিলেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্ট দান বলিয়া চিরকাল গণ্য হইবে।

মহাকাব্য ও নবীনচন্দ্র

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী,
সহ-সম্পাদক, "যুগান্তর"

মহাকাব্যকে আমরা দু'টী শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, একটী হচ্ছে Authentic (মূল) এবং অপরটী হচ্ছে Literary বা সাহিত্যধর্ম্মী। মহাভারত, Illiad, রামায়ণ, Song of Roland প্রভৃতি এক শ্রেণীর এবং রঘুবংশ, মেঘনাদবধ, Paradise Lost প্রভৃতি অপর শ্রেণীর মহাকাব্য।

মূল মহাকাব্য হচ্ছে সেই জাতীয় মহাকাব্য যা সেই সময়ের কাব্য বর্ণিত ঘটনা নিয়ে চারিপার্শ্বের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে; অর্থাৎ যার মধ্যে সেই যুগীয় আবহাওয়া বর্ত্তমান। তার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে সেই যুগ এবং সেই দেশের কথা, যে যুগ এবং যে দেশের মধ্যে কবি নিজে মানুষ হয়েছেন বা তারই কাছাকাছি কোন যুগে তিনি জন্মেছেন, অন্ততঃ যে যুগের সঙ্গে তাঁর নিজের যুগের দৃষ্টিভঙ্গিগত খুব বেশী তফাৎ হয়নি। সাহিত্যধর্ম্মী মহাকাব্যের মধ্যে মহাকাব্যের যুগের ঘটনা থাকে বটে, কিন্তু কবি ঘটনাগুলিকে নিজের যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নূতন করে রাঙ্গিয়ে তোলেন বা নূতন ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করেন।

মূল মহাকাব্যকে অনেকে বলেছেন যে সেটা "intended for recitation." মানুষকে যে জিনিস শোনাতে হয় তার মধ্যে ভেতরের সৌন্দর্য্য, গভীরতা বা সূক্ষ্মতার চেয়ে বাইরের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে হয়। কিন্তু যা পড়বার জিনিষ তার রচনারীতি স্বতন্ত্র। কারণ পড়বার সময় মানুষ শুধু পড়ে না, ভেবে পড়ে। শুনবার সময় মানুষ শুধু শোনে, ভাববার অবকাশ থাকে কম।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং নবীন সেনের মহাকাব্য সাহিত্যধর্ম্মী মহাকাব্য। সে মহাকাব্য শোনবার চেয়েও পড়বার জন্য এবং প'ড়ে

বুঝবার জন্যই বিশেষভাবে লেখা। মাইকেল এবং নবীনচন্দ্র এঁরা দুজনেই এঁদের নিজের নিজের মত করে মহাকাব্যের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে এই যে মাইকেলের মহাকাব্যের বিষয়-বস্তু সঙ্কীর্ণ আর নবীনচন্দ্রের বিষয়বস্তু বিস্তীর্ণ। এই বৃহত্তর জীবনে (জাতীয় জীবনে) তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সংহত রূপ নিয়েছে—ক্রমবর্দ্ধিত ও ক্রমবিবর্ত্তিত জাতীয় জীবনের ইতিহাসই এই মহাকাব্যে এক হয়ে গেছে। রৈবতকের শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁকে মানুষের মত করে দেখেছেন—স্বর্গ থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছেন এই মাটির পৃথিবীতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দিয়েছেন মর্য্যাদা।

"Ravan is a grand fellow"—মধুসূদনের এই বাণী—এটা সেই যুগেরই বাণী। নবীন, হেমচন্দ্র, মধুসূদন এদের তিনজনের প্রতিভাই এই একইভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে মধুসূদনেই এর আরম্ভ। চরিতশাখাতে মানুষ হয়ে উঠেছিল অবতার, আর এঁদের কাব্যে দেবতা বা অবতার হয়ে উঠলো মানুষ।

অবতারকে মানুষ হিসেবে না দেখলে তাকে যে নিজের করে পাওয়া যায় না, নবীনচন্দ্র যেন নিজেই তা ব্যক্ত করেছেন তাঁর বুদ্ধদেবের জীবন (অমিতাভ) রচনা প্রসঙ্গে—"এ কাব্যখানির প্রণয়ন সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদের কাছে বিশেষরূপে ঋণী। তবে তাঁহারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্লাধিক অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আপন বলিয়া বোধ হয়।"

নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই তিনটী মূলতঃ

একই। তিনখানাতেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উন্মেষ, 'মধ্যলীলা ও 'শেষলীলা এই তিনটী রয়েছে। রৈবতকে সমস্ত বৃন্দাবনের লীলায়—শৌর্য্য-বীর্য্যে, কর্ম্মজ্ঞানে, নীতিকুশলতায় শ্রীকৃষ্ণ মানুষের রূপ নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ মানুষের সঙ্গে একটা জাতির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। একটা বিশেষ যুগের—একটা বিশেষ জাতির ইতিহাস—শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারত (Greater India) গঠন করবেন এই সঙ্কল্প ছিল।

ধর্ম্ম রাষ্ট্রের দিক থেকে সে সময়ে বৈষম্য ছিল প্রচুর। আর্য্যদের ধর্ম্ম এবং অনার্য্যদের ধর্ম্ম—এই দুই বৃহৎ ধর্ম্মের মধ্যে ছিল সংঘাত। তা ছাড়া আর্য্যদের ধর্ম্মের মধ্যেও ছিল বহু ভাগ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভেদের পথে টানে—ঐক্যের পথে টানে না। এক একটা দেবতাকে অবলম্বন করে বহু ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে এদেশে। এক বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অবলম্বন করে যেমন বহু বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তেমনি আবার বহু প্রকার শৈব মতও গড়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে ধর্ম্মের সাহায্যে জাতি বহুধা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। তার প্রভাব পড়ে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ওপরে। তাই তাঁর আদর্শ হলো যে এমন উদার ধর্ম্ম স্থাপন করা হবে যার সাহায্যে একটা বিরাট জাতি উঠবে গ'ড়ে। তা' হলেই জাতির কল্যাণ। এই কারণেই নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন—

"এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত,
বেঁধে দিব আমি।"

নবীনচন্দ্র ইতিহাসকেও বদলেছেন, নিজের করে চলতে গিয়ে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষত্রিয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন এই বিদ্রোহের ফলে ব্রাহ্মণগণ অনার্য্যদের সঙ্গে মিশে গেলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বিদ্রোহের নজির ইতিহাসে ঠিক পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন গোঁড়া রক্ষণশীল

ধর্মের বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ সব ক্ষত্রিয়ই করেছে। বুদ্ধদেবের ধর্ম, রামচন্দ্রের উদারতা এর নিদর্শন। জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর ক্ষত্রিয়, তিনি ছিলেন উদার প্রচারক। কিন্তু নবীনচন্দ্র বর্ণিত বিদ্রোহ ঠিক ইতিহাসের বিষয় নয়।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে বিজয়ী জাতি হিসাবে আসেন। তাঁরা এসে এদেশের আদিম অধিবাসীদের সমস্ত সভ্যতা নষ্ট করে দেন। তাই অনার্য্যদের রাগ ছিল আর্য্যদের ওপরে। ব্রাহ্মণ অনার্য্যদের সঙ্গে এক হয়ে গেল, এর নজির পাওয়া কঠিন, কিন্তু নবীনচন্দ্র ঐরূপ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-অনার্য্য সংঘাতটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। নবীন সেনের এই সংঘাত পরিকল্পনায় ইতিহাসের দিক থেকে আপত্তি আছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্মের দিক থেকে বিচার করলে এর সার্থকতা একেবারে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মাইকেল তাঁর মহাকাব্যকে যে ভাবে রূপায়িত করেছেন তার সঙ্গে নবীনচন্দ্রের আরও একটু প্রভেদ রয়েছে। মাইকেল এদেশের মালমশলাকে বিদেশী ছাঁচে ঢেলেছিলেন। কিন্তু নবীন সেনের ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল প্রবল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে আদর্শের দিক থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের conceptionটা রবীন্দ্রনাথের শিবাজীতে পাওয়া যায়।

মানুষ চেতন, সে কেন জড় পদার্থকে পূজা করবে? —এই কথা নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করেছেন। অনেকে বলেন যে এই আদর্শ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। একথা মোটেই ঠিক নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আপত্তি তোলেন যে এটা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের বহু পূর্ব্বে নবীন সেনের বই ছাপা হয়। তা' ছাড়া বঙ্কিম ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল, নবীনচন্দ্রের ধর্ম্মবুদ্ধি থাকলেও তিনি অত রক্ষণশীল নন।

মাইকেল যেমন মহাকাব্য রচনা করবেন এই সঙ্কল্প নিয়ে মেঘনাদ-বধ রচনা করেছিলেন, নবীনচন্দ্র তা' করেন নি। তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যে সমস্যা ছিল, সেই আদর্শ নিয়ে মানুষের জীবন গড়ে তুলবার প্রয়োজন অনুভব করে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বিষয়বস্তু এবং আরও কোন কোন দিক দিয়ে তাঁর কাব্য মহাকাব্যের স্তরে এসে পৌছেছে।

নবীনচন্দ্রের দর্শন ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্ব।*

ডাঃ শ্রীরমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্), এফ্-আর্-এ-এস্-বি

সুভদ্রা-চরিত্র

চরিত্রাঙ্কনে মহাকবি নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা সকলেই জানেন। বিশেষভাবে, তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক। এই সব চরিত্রের মাধ্যমিকতায়, নবীনচন্দ্র দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতির বহু উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করে গেছেন। নবীনচন্দ্রের রচিত "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" এবং "প্রভাস"—এই "নব মহাভারতত্রয়" সত্যই বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ব বস্তু। "নব মহাভারতত্রয়" এই নামকরণ সার্থক হয়েছে, কারণ এই মহাকাব্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীচরিত্র অবলম্বনে রচিত হলেও, এর ঘটনাবলী ও চরিত্রাঙ্কন বহু স্থলেই সম্পূর্ণ মৌলিক। শৈলজা ও সুলোচনা নারী-চরিত্র দুটি নবীনচন্দ্রেরই নিজস্ব সৃষ্টি, কারণ—মহাভারতাদিতে এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্জ্জুন-পত্নী সুভদ্রার চরিত্র অঙ্কনেও নবীনচন্দ্র যথেষ্ট মৌলিকতা দেখিয়েছেন। সুভদ্রা চরিত্রের যে সব বৈশিষ্ট্যের

*নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬), তারিখে সিনেট হলে পঠিত।

কথা আমরা মহাভারত থেকে মাত্র আভাষে ইঙ্গিতেই জানতে পারি, নবীনচন্দ্র তাঁর অপূর্ব্ব রচনাশক্তি প্রভাবে সেই সব দিকই অতি জলন্ত, জাগ্রত ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি সুভদ্রাকে অন্যান্য বহু দিক থেকেও ফুটিয়ে তুলেছেন যা মহাভারতে আমরা পাই না। সেজন্য নবীনচন্দ্রের সুভদ্রাকে একটি মৌলিক চরিত্র বললেও খুব ভুল হবে না।

সুভদ্রা-চরিত্র সত্যই নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থেরই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য "কুরুক্ষেত্র" থেকেই কেবল সুভদ্রা-চরিত্রের একটিমাত্র দিক সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। সেটী তাঁর জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলা, দার্শনিকা ও সত্যদ্রষ্টী ঋষি-মূর্ত্তি। এই থেকে আমরা কবির নিজের দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় মতবাদের বিষয়ে বহু কথা জানতে পারি। সুভদ্রা সর্ব-শাস্ত্রপারঙ্গমা ছিলেন, এবং সুযোগ পেলেই তিনি অপর সকলকে দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতির গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। পুত্র অভিমন্যুকে তিনি স্বয়ং দর্শন শিক্ষা দিচ্ছেন, এই চিত্র আমরা কুরুক্ষেত্রে পাই। কবি বলছেন—

> "সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
> পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত
> লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্ম্ম তত্ত্বরাশি,
> নিত্য, সত্য, সনাতন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি।"

সুভদ্রার মুখ দিয়ে কবি দর্শনের যে মূলতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন তা সংক্ষেপে এই:

একমেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। তিনি অব্যক্ত হয়েও বিশ্বে পরিণত হন—সেজন্য বিশ্বই তাঁর মূর্ত্ত-

রূপ। এই স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি কেন বিশ্বে পরিণত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন? তার উত্তর এই যে, এ তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতি। স্বভাব বশেই তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন, কোন অভাব মেটাবার তাগিদে নয়, কোন বলবত্তর পুরুষ বা শক্তির ভয়ে বা আদেশে নয়।

"অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন।"

প্রলয়ের পরে সর্ব্বভূত ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে তাঁরই সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে এবং তাঁর প্রকৃতি পায়। সৃষ্টির সময়ে তাদের আবার নূতন সৃষ্টি হয়। এই ভাবে ক্রমাগত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে চলেছে।

এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, পরমকরুণাময় ভগবানের রাজ্যে এরূপ লয় হবে কেন? কল্পপ্রলয়ের কথা বাদ দিলেও, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চতুর্দ্দিকেই আমরা ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখতে পাই। এই নির্ম্মম সংহার মঙ্গলময়ের বিধানে থাকবে কেন? দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান প্রশ্ন ও সমস্যাই হ'ল এই—ভগবানের অনন্ত করুণার সঙ্গে তাঁরই সৃষ্ট জগতের অনন্ত দুঃখের সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব কি করে? কিন্তু কবির কাছে এ সমস্যা সমস্যাই নয়, কারণ তিনি জগদীশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী। ঈশ্বর যে মানবের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁর বিধানে যে অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ও অমঙ্গলের লেশমাত্র নেই—এই বিশ্বাস যদি আমাদের থাকে, তাহলে জগতের আপাতদৃষ্ট অমঙ্গল, অন্যায় ও দুঃখ শোকেরও ধর্ম্মসঙ্গত কারণ খুঁজে পেতে আমাদের দেরী হয় না। পরমবিশ্বাসী কবিও সেজন্য সুভদ্রার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—

"নহে নির্দ্দয়তা বৎস! ধ্বংসনীতি দয়াধার
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার!"

জগতের মঙ্গলের জন্যই ধ্বংসের অত্যাবশ্যকতা। যদি জগতে

মৃত্যু না থাকত, তাহলে অন্নাভাবে, স্থানাভাবে জীবদের কি দশা হ'ত, তা কল্পনা করা যায় না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ না থাকত, তাহলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে জগৎ মহাশ্মশানে নিশ্চয় পরিণত হ'ত। যদি লোভীকে, পাপীকে, অত্যাচারীকে বিনষ্ট করা না হ'ত, তাহলে বিশ্বরাজ্য ত নরকই হয়ে দাঁড়াত। যদি বিষবৃক্ষ উৎপাটিত ও দাবানল নির্ব্বাপিত করা না হ'ত, তাহলে সুরম্য বনের কতটুকু থাকত অবশিষ্ট? সেজন্য মৃত্যু, হত্যা, ধ্বংস—এসব সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, এদেরও প্রয়োজনীয়তা ও মঙ্গলময়ত্ব আছে।

"সর্ব্বভূতহিত তরে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয়।
দগ্ধ করে বৈশ্বানর তবু অগ্নি দয়াময়।"

সুতরাং পৃথিবীর দুঃখশোকের জন্য ভগবানকে নিষ্ঠুরতা দোষে দোষী করা আমাদের অজ্ঞানতারই ফলমাত্র। জীবের কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংখ্যাতীত ধ্বংস ও সংখ্যাতীত সৃষ্টি করছেন—এই ভাবেই জগতের স্থিতি সাধিত হচ্ছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সবই তাঁর মঙ্গল বিধানের ফল।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই মহান্ বিশ্বস্রষ্টাকে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব জানতে পারি কি করে? কবির কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা ভয় নেই, তিনি জানেন যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে জানবার একটি অতি সহজ উপায় আমাদের হাতে আছে—সেটি ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে জানা। জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য, পরিণাম, মূর্ত্তরূপ। অতএব জগৎকে জানলেই জগদীশ্বরকে জানা হয়। সেজন্য সুভদ্রা বলছেন—

"জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার
বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস! সোপান দ্বিতীয় আর।"

অবশ্য বিশ্বকে জানা অর্থ, এর প্রকৃত রূপ, প্রকৃত সত্তাকেই জানা, এর প্রত্যেক ব্যাপারের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা। নয় ত,

চিন্তা না করেই জগৎ থেকে জগদীশ্বরের ধারণা করার চেষ্টা করলে, তিনি যে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই সিদ্ধান্তেই আমরা প্রথমে পৌঁছাই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তাঁর শাশ্বত মঙ্গলময়, সৌন্দর্য্যনির্ঝর রূপটি সকল অমঙ্গল ও কুশ্রীতার মধ্যেও আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে।

জগদীশ্বর স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। সেজন্য জগতের উচ্চনীচ সব বস্তুই ব্রহ্মময়, মানুষে মানুষে ভেদ নাই। সেইজন্য সুভদ্রা সুলোচনাকে বলেছেন—

"এক ভগবান্ সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?"

এ স্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি সব বস্তুই, সব মানবই একই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়, তাহলে আর্য্য ও অনার্য্য, পণ্ডিত ও মূর্খ, পুণ্যবান্ ও পাপীর ভেদ কি মিথ্যা? কবির মতে এই সব ভেদ মিথ্যা নয়, কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্যও নয়। একই বস্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রূপেই প্রকাশ লাভ করে, কিন্তু যদি এই সব স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ দূর করা যায়, তাহলে বস্তুর আর ভেদ রইল কই? যেমন, একই জল নদীতে নির্ম্মল, সরোবরে পঙ্কিল। নির্ম্মল জলে ও পঙ্কিল জলে ভেদ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পঙ্কিল জলের নির্ম্মল হয়ে নির্ম্মল জলের সঙ্গে এক হতেও ত বাধা নেই। একই ভাবে, আমাদের নিজেদের কর্ম্মফলানুসারেই আমরা উচ্চনীচ ভাবে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু পুনরায় আমাদের কর্ম্ম দ্বারাই উচ্চ নীচ বা নীচ উচ্চ হতে পারে। সেইজন্য অনার্য্য কন্যা জরৎকারু যখন ক্ষোভ করে বললেন—

"কিন্তু আমি নারী অনার্য্যা; আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যার!

পশুপক্ষী যেই দয়া পায় আর্য্যদের কাছে,

আমরা অনার্য্য নাহি পাই বিন্দু তার"—

তখন—"না বোন! অনার্য্য আর্য্য"—কহিতে লাগিলা ভদ্রা—

"একই পিতার পুত্র-কন্যা সমুদয়।

এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ সকলের

এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয়।

স্থানভেদে, কালভেদে, কর্ম্মভেদে জন্মে জন্মে,

কোথাও পঙ্কিল জল, কোথাও নির্ম্মল।

সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্ম্মে

কর অপনীত, হবে যে জল সে জল।"

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান যদি এই ভাবে প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীবেই নিহিত থাকেন, তাহলে সেই সেই বস্তুর অসম্পূর্ণতা, সেই সেই জীবের পাপপুণ্য, কর্ম্মফল কি তাঁহাকে কলুষিত করে না? তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলে সর্ব্বভূতে অবস্থিত থেকেও স্বয়ং নির্লিপ্ত ও নির্বিকারই থাকেন। সুভদ্রা অভিমন্যুকে উপদেশ দিচ্ছেন—

"নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত

আকাশ যেমন,

সর্ব্বদেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা

নির্লিপ্ত তেমন।"

সুভদ্রার মুখ দিয়ে নবীনচন্দ্র যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন তা সংক্ষেপে এই :—ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা ও ধ্বংসকারী। তিনি সুখের সঙ্গে দুঃখেরও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু দুঃখের প্রয়োজনও সুখের চেয়ে কম নয়। সুতরাং রুদ্র হয়েও তিনি শিব। জগৎ তাঁহার প্রতিচ্ছবি বলে, জগতের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে জানতে পারি। তিনি জাগতিক সকল বস্তুর প্রাণস্বরূপ, অন্তরাত্মা বলে

সকলেই স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, যদিও কার্য্যতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভিন্ন। জগদীন ও অন্তর্যামী হলেও পরমব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন।

এখন নবীনচন্দ্রের ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সুভদ্রা কেবল দার্শনিকা ছিলেন না, ধর্ম্ম ও নীতিকুশলাও ছিলেন, এবং তাঁর মুখ দিয়ে নবীনচন্দ্র ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্বের এক সুমহান্ আদর্শের প্রচার করেন। "ধর্ম্ম" কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সুভদ্রা বলছেন "ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম পালন।" প্রত্যেক জীবেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য, কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে। পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী হলেও, জীবই কর্ম্মকর্ত্তা, ঈশ্বর নহেন। প্রত্যেক জীবেরই স্বভাব, স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, এবং সেই স্বভাব অনুসারেই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যেমন স্বয়ং ভগবান স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে জীবজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করেন, সেরূপ মানবেরও নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত-ভাবে ও সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে পালন করা উচিত। এই হ'ল জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুভদ্রা পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন:—

"স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্ম্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম্ম সনাতন।"

এই নিষ্কাম কর্ম্মসাধন বা স্বধর্ম পালনের কথা কবি বারংবার সুভদ্রার মুখে প্রপঞ্চিত করেছেন। তিনি পুত্রকে বলছেন যে, সংসার সরসীতে পদ্মপত্রে জলের মতই থাক, অর্থাৎ সংসারে থেকেও সংসারাসক্ত হয়ো না; মনটিকে সম্পূর্ণ নিষ্কাম রাখ, সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মেই সমর্পণ কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে। বাসনা কামনাই অশান্তির মূল কারণ। সেইজন্য সুভদ্রা অরংকারকে বলছেন—

"হৃদয় হইতে এই করাল কামনা ছায়া
মুছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।

তুমি আমি কে আমরা ? যিনি করিলেন সৃষ্টি
তিনি করিলেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।"

ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়ে নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত করছেন। নিষ্কাম ভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই স্বধর্ম পালন। যেমন; ক্ষত্রিয়কে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের জন্য। সেজন্য সম্পূর্ণ স্বার্থহীন ভাবে জগৎরক্ষাই হ'ল ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বা পরম ধর্ম—প্রয়োজন হলে ধর্মযুদ্ধে খড়্গ ধারণ করতেও ক্ষত্রিয়ের বিমুখ হওয়া অনুচিত। যুদ্ধবিমুখ অভিমন্যুকে সুভদ্রা বলছেন—

"বীরত্ব প্রকৃতি তব, স্বধর্ম যুদ্ধ তোমার,
ধর্মযুদ্ধ হতে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।"

পুরুষের স্বধর্ম যেমন যুদ্ধ, নারীর স্বধর্ম তেমনি আর্ত্তসেবা। এই কথা নবীনচন্দ্র "নারীধর্ম" নামে তৃতীয় সর্গে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন। এই সর্গে আমরা সুভদ্রাকে দেখি অক্লান্ত সেবকা, মমতাময়ী নারীরূপে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে একাদশ দিন ধরে তিনি সমানে অহোরাত্র শিবিরে শিবিরে ঘুরে আহতদের শুশ্রূষা করে বেড়াচ্ছেন—অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর মুখ বিবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, কেশভার ধুলায় ধূসর, তবু তাঁর সেবার বিরতি নেই। তাঁর প্রিয়সখী সুলোচনা এই নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করলে সুভদ্রার মুখ দিয়ে কবি যে সুপবিত্র, মহান্ নারী-ধর্মের প্রপঞ্চনা করিয়েছেন তা সত্যই জগতের শ্রেষ্ঠ নীতিধর্মের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। "রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া"—এই হ'ল রমণীর শ্রেষ্ঠ সুখ, এই হ'ল নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এরই জন্যে হয়েছে জগতে নারীসৃষ্টি। বিধাতা অগ্নি সৃষ্টি ক'রে, অগ্নির দাহ শীতল করবার জন্য জলেরও সৃষ্টি করেছেন। সেইরূপ, পৃথিবীতে রোগ, শোক, দুঃখ সৃষ্টি ক'রে তিনি প্রেমপূর্ণ নারীবুকও সৃষ্টি করেছেন। নারীর এই আর্ত্তসেবায় শত্রুমিত্র ভেদ থাকা উচিত নয়—তাঁর নিকট সব জীবই

আমরা জগতে অনন্ত দুঃখভাগী হই। প্রকৃতপক্ষে আনন্দময়-ব্রহ্মের মূর্তরূপ জগৎও ওতপ্রোতভাবে আনন্দময়; কিন্তু এই আনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করতে হবে আমাদের জগতের সঙ্গে এক হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সুভদ্রা বলেছেন, সুখের জন্য জগৎ আকুল, সকলেই সুখ অন্বেষণ করছে। কিন্তু এই জগৎই যে সুখময়, বিধাতারই ন্যায় নিত্যসুখময়। সুখ ঝরছে অজস্র ধারায় জ্যোৎস্নায়, বইছে ঝটিকায়, গর্জন করছে জীমূতমন্দ্রে, বর্ষিত হচ্ছে বরিষায়, গাইছে কোকিলের কণ্ঠে, নিশ্বাস ফেলছে মলয়সমীরণে, ফলছে তরুদলে, ফুটছে ফুলে, ভাসছে জলে, হাসছে দিবালোকে। জগতের চারিদিকেই ত সুখের প্রস্রবণ বইছে, সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস উঠছে, "সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্ব্বময়।" তবুও একমাত্র মানুষ অসুখী, নিজদোষে, নিজ স্বার্থকলুষিত ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে একমাত্র মানুষই এই আনন্দরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে আছে।

"কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের উঠিছে উচ্ছ্বাস!
কি সুখসঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ।
কেবল মানব পথভ্রষ্ট নিয়তির—।
তাই মানবের হায়! এ দুঃখ গভীর।"

তাই আজ মানবকে স্বার্থদ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র কারাগার ভেঙে ফেলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক হয়ে মিলতে হবে, বিশ্বহিতকেই নিজের হিত বলে বুঝতে হবে, বিশ্বপ্রেম ব্রত পালতে হবে। এমন কি, কেবল তপস্যাতেও মানবের সুখ নেই, সার্থকতা নেই, যদি সে তপস্যার সঙ্গে না যুক্ত হয় পরসেবা।

"মানুষের সুখ
নহে গৃহে, নহে বনে বুঝি নাহি হায়!
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়। * * *
এ মহা ধর্ম্মের
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত।"

নারীসমাজকে লক্ষ্য করে আজ এই কবির শুভ জন্মদিনে আমার একটি কথা বলবার আছে। নবীনচন্দ্রের ঐক্যবদ্ধ নবভারত প্রতিষ্ঠার মূলে আছে শৈলজা ও সুভদ্রা; অর্থাৎ মহামহীয়সী নারীর প্রচেষ্টায় নব মহাভারত প্রতিষ্ঠিত হবে—এই আমাদের ঋষি নবীনচন্দ্রের আর্যোক্তি। হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু নিষেকে নবীনচন্দ্র এ মহামহিমময়ী নারী সৃষ্টি করেছেন; ফলতঃ তুলনায় শৈলজা সুভদ্রার কাছে বাসুকি-অর্জুন চরিত্র বিশেষ ভাবে নিষ্প্রভ, মলিন। বিশেষভাবে, সুভদ্রাকে তিনি এঁকেছিলেন এক মহীয়সী দেবীরূপে—যিনি দর্শন, ধর্ম ও নীতির গূঢ় তত্ত্বের সবটুকুই আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু কেবল আয়ত্ত ও প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, স্বয়ং সে সব নীতি কঠোর ভাবে পালনও করেছিলেন। এই সুভদ্রাই সুভদ্রাহরণকালে শত্রুব্যূহ ভেদ করে অসমসাহসে পার্থের রথ চালনা করেছিলেন, এবং অর্জুন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে চরণে রথের রশ্মি চেপে ধরে, করে ধনু নিয়ে সাত্যকির শর ব্যর্থ করে পার্থের মূর্চ্ছিত দেহ সংরক্ষণ করেন। এই সুভদ্রাই আবার শত্রুমিত্র নির্বিচারে আর্তসেবায় প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন, অনার্য্যা কন্যাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন এবং আর্য-অনার্যে ভেদ দূর করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন—এ সবই অবশ্য নবীনচন্দ্রের মৌলিক কল্পনা, মহাভারতে এ চিত্র আমরা পাই না। পুনরায়, পুত্রের বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তিনি তাকে যুদ্ধে যেতে বাধা ত দেনই নি, উপরন্তু উৎসাহিত করেছেন। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—জ্ঞানবিজ্ঞানে গরীয়সী, বীরত্বে অতুলনীয়া, কঠোর কর্তব্যে অনমনীয়া, অথচ বিশ্বজননী, জননীপ্রেমে মমতাময়ী, সেবাময়ী মূর্তি—এই হল নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা। নারীজাতির উপর নবীনচন্দ্রের কি উচ্চ ধারণা ছিল, এবং তাঁদের উপর তাঁর কি অশেষ আশা-ভরসা ছিল, সুভদ্রা চরিত্র থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাই নারীসমাজ আজ নবীনচন্দ্রের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। তাঁরা

তাঁর সামান্য প্রতিদান আজ করতে পারেন, যদি নবীনচন্দ্রের আদর্শে তাঁরা নবমহাভারত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সার্থককামা হন। ভারতের জাগ্রত নারীসমাজ নবীনচন্দ্রের জন্মদিনে আজ এবিষয়ে বদ্ধ-পরিকর হউন।

নবীনচন্দ্র তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় যে মহান্ ত্যাগ, প্রেম ও ঐক্যের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তা আমাদেরই অতি নিজস্ব বেদবেদান্ত উপনিষদের শাশ্বতী বাণী। ভারতের মুক্তির সাধক সত্যদ্রষ্টা ঋষি নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই বাণীই পুনরায় বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" আজ জড়বাদী পশ্চিমের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও আমাদের এই চিরন্তন বিশ্বপ্রেমের আদর্শ বিস্মৃত হতে বসেছি। সেজন্য জাতির এই চরম দুর্দ্দিনে নবীনচন্দ্র-প্রমুখ বিশ্বপ্রেমের পূজারী, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবক, যুগনেতৃগণের বাণী আমাদের সযত্নে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বজনীন সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত "প্রেমময়, পুণ্যময়, শান্তিময়, সুধাময়" যে "মহান্ ধর্ম্মরাজ্যের" স্বপ্ন নবীনচন্দ্র দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাই হবে কবির প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

"বুঝিবে মানবগণ, সর্ব্বজীবে নারায়ণ,
সর্ব্বজীব-হিত মহাধর্ম্ম নিরমল।
এই নবধর্ম্মে, ভগ্নি! হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল।"

নবীনচন্দ্রের সুভদ্রার এই আশা যেন শীঘ্রই সফল হয়—এই প্রার্থনাই আজ কবির শতবার্ষিক জন্মোৎসবে করছি।

সপরিবারে নবীনচন্দ্র সেন

মহাকবি নবীনচন্দ্র

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, এম্‌এ,

সহসম্পাদক, যুগান্তর

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ আমরা লোকান্তরিত ভাবুক, ভক্ত, দেশপ্রেমিক কবির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যেখানে সুরু, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে নবীনচন্দ্র লেখনী ধরেছিলেন —দেশকে তিনি শুনিয়েছেন দেশাত্মবোধের বাণী, ধর্মের বাণী, উদার বিশ্বমানবতার বাণী, বাংলার তিনি চিরবরণীয়, চিরস্মরণীয় কবি, বাঙালীর তিনি বিশিষ্ট অগ্রগামী নেতা। মধুসূদন, দীনবন্ধু ও বঙ্কিম প্রতিভার ত্রিবেণীধারায় যেদিন বাংলার ভাব-জীবনে নবযৌবনের বন্যা এনেছিল, সেদিন তাঁদেরই সঙ্গে, তাঁদের যোগ্য সুহৃদ ও সহকর্মীরূপে আবির্ভূত হন কবি, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। স্বাধীনতাহীন, আত্মচেতনা ও আত্মমর্য্যাদাহীন জাতিকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা, তার ঐতিহ্য ও জীবন দর্শনকে যুগ ও জীবনের প্রয়োজনে নূতন করে ব্যাখ্যা করা—এক কথায় জাতিকে মনুষ্যত্বের সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলাই ছিল এদের সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য।

এক দিকে প্রাচ্য সংস্কৃতি যখন উপযুক্ত রক্ষণ ও অনুশীলনের অভাবে বিচারবিমূঢ় অভ্যস্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে, অন্য দিকে প্রতীচ্য সংস্কৃতি যখন এসেছে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারপ্রিয়তার উদ্দীপনা রূপে, এমন দিনে দেশকে তার স্বধর্মে রক্ষা করা, আবার অগ্রগামী জগতের সঙ্গে তাকে একতালে এগিয়ে নিয়ে চলা যে কত কঠিন কাজ ছিল, সে কথা ভেবে দেখবার মতো। এই দুষ্কর কাজকে যাঁরা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করেছিলেন, তাঁদের কাছে সমগ্র জাতই অপরিসীম পিতৃঋণে আবদ্ধ, একথা আজকের ছেলে-মেয়েদের মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয়

সংস্কৃতির এই জন্মান্তর, বিশ্বাস যে সমস্ত ভাবুক, নায়ক ও লেখকের সম্মিলিত সাধনায় সম্ভবপর হয়েছে, কবি নবীনচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম, অনেক হিসাবে প্রধানতমই। তাঁর উদ্দেশে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাঙালীই শ্রদ্ধানতি জানাবেন, তাতে সন্দেহ নেই। যে পলাশীর পরাজয়ে ভারতবর্ষ প্রথম পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল, সেই জাতীয় বিপর্যয়ের কাহিনী লিখেই নবীনচন্দ্র সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত বেদনার অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেশপ্রেমিক কবির সত্যদৃষ্টি যে উজ্জ্বল অনাগত ভবিষ্যতের অভিমুখে প্রসারিত হয়েছিল, তার প্রাণবন্ত সাফল্য রয়েছে 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রতিটী ছত্রে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বিমুগ্ধ হৃদয়ে স্বাগত করেছিলেন এই কাব্যকে, কবিকে সম্মানিত করেছিলেন বাংলার বাইরণ আখ্যায়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের উন্মেষশালিনী প্রতিভা শুধু এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকলো না।

তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থত্রয় 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র,' 'প্রভাসে' ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে সমগ্র মহাভারতের প্রাণবাণীকে তিনি নূতন জীবন—দর্শনের আলোকে পুনরুদ্ঘাটিত করলেন। একদিকে আর্য্যভারতের আত্মসম্প্রসারণের উদ্যম, অন্যদিকে অনার্য্য-ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাগরণ দুইয়ের সেই অন্তঃপ্রবাহী সঙ্ঘর্ষ যেখানে এসে শেষ হল, প্রভাসের সেই প্রসঙ্গ সমাপ্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে কবি আমাদের শোনালেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী, সার্ব্বভৌম মনুষ্যত্বের বাণী। জাতি, ধর্ম ও লোকাচারের বেড়াজাল-মুক্ত নির্ব্বিশেষ মনুষ্যত্বের সেই বাণী আমরা শুনেছি রবীন্দ্রনাথের মুখে; নবীনচন্দ্রে আমরা পেয়েছি তারি লেখনীর পূর্ব্বাভাস।

তাঁর ধর্মব্যাখ্যান ও জীবন দর্শন বিশ্লেষণের এই ঔদার্য্য, তাঁর অকপট দেশপ্রেমের চেয়ে কম বরণীয় নয়। এই ঔদার্য্যের অনুপ্রেরণাতেই তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতন্যের জীবন কাহিনী কাব্যে লিখেছিলেন। এবং লোকগুরু মোহাম্মদের জীবন কাহিনীও লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। অভাগিনী ক্লিওপেট্রাকে তিনি মহানারীর সম্মান দিয়েছিলেন তার জীবন কাহিনী কাব্যে লিপিবদ্ধ করে—সেও এই মনোধর্ম্মের প্রেরণাতেই।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে এই দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি কাজ করেছে, সে কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সেদিন চলেছে তুমুল সঙ্ঘর্ষ—ধর্ম্মের মহান লক্ষ্য ও আদর্শকে বর্জ্জন করে অনুষ্ঠানকে বড় করে তোলার আন্দোলন চলছিল যাঁদের নেতৃত্বে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। দেশের একাংশে রক্ষণশীল জড়তাকে আঁকড়ে ধরার দিকে আসছিল একটা উৎকট উন্মাদনা; এমন দিনে ধর্ম্মকে লোকাচারের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে সার্ব্বভৌম মানবত্বের পটভূমিতে তার বিরাট সার্থকতা প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন নবীনচন্দ্র—তাঁর এ কীর্ত্তির সমুচিত মূল্য কোন দিন নির্দ্ধারিত হবেই, যেহেতু তাঁর অতুলনীয় কবি-কীর্ত্তির চেয়েও এ কীর্ত্তির মূল্য অনেক বেশী। নবীনচন্দ্রের কাব্য, সাহিত্যের বস্তু ও বিন্যাস-নিপুণতা বা তাঁর গদ্যসাহিত্যের সুচারু বিন্যাস-চাতুর্য্য নিয়ে আলোচনার অবসর এ নিবন্ধে হবে না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবাদর্শের গোড়ার কথাটা ধরিয়ে না দিলে আধুনিক পাঠক তাঁর সাহিত্যিকতার মর্ম্ম-সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারবেন না বলে শুধু সেই দিকেই আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি।

আজকের দিনে জীবন ও মরণের সকল ক্ষেত্রেই একটা জাগরণ ও অগ্রগামিতার হাওয়া এসেছে—আজ আমরা বর্ণাশ্রমিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গলদ সংশোধন করে নূতন সমাজ-চেতনার প্রবর্ত্তন করতে চাইছি, নরনারীর সম্পর্ক বিধানে সমানাধিকারের তত্ত্বকে স্বীকার করছি, মানুষের অখণ্ড ঐক্য ও সর্ব্বাঙ্গীন একত্বকে সাহিত্য ও শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছি—আমাদের অনেক আগে যে মহাকবি তাঁর রচনাবলির ভেতর দিয়ে এই সব পথে সাহসের সঙ্গে পা বাড়ানোর প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, শতবার্ষিক স্মরণোৎসব তিথিতে তাঁকে কে না শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন? দেশের মর্ম্মলোকে তাঁর বাণী পরিব্যাপ্ত হক, জাতির ইতিহাসে তাঁর দান অবিনশ্বর হক, এই আজ আমাদের আন্তরিক বাসনা।

প্রাচ্যবাণীর বিভিন্ন শাখা

কাশী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণতীর্থ,

সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী, কাশী শাখা

৬৪, খালিসপুরা, কাশী

দিল্লী

শ্রীযুক্ত মধুসূদন নন্দী,

সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী, দিল্লী

৭, পাঁচকুয়া (Panchquin) রোড, নিউ দিল্লী

সিমলা

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ভট্টাচার্য,

সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী, কালীবাড়ী, সিমলা

কটক

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঘোষ,

সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী, কটক শাখা

ভাষাক্লেশ লেন, কটক

চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ,

সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী, চট্টগ্রাম শাখা

দুর্গামণী ঔষধালয়, কাটাপাহাড়, চট্টগ্রাম